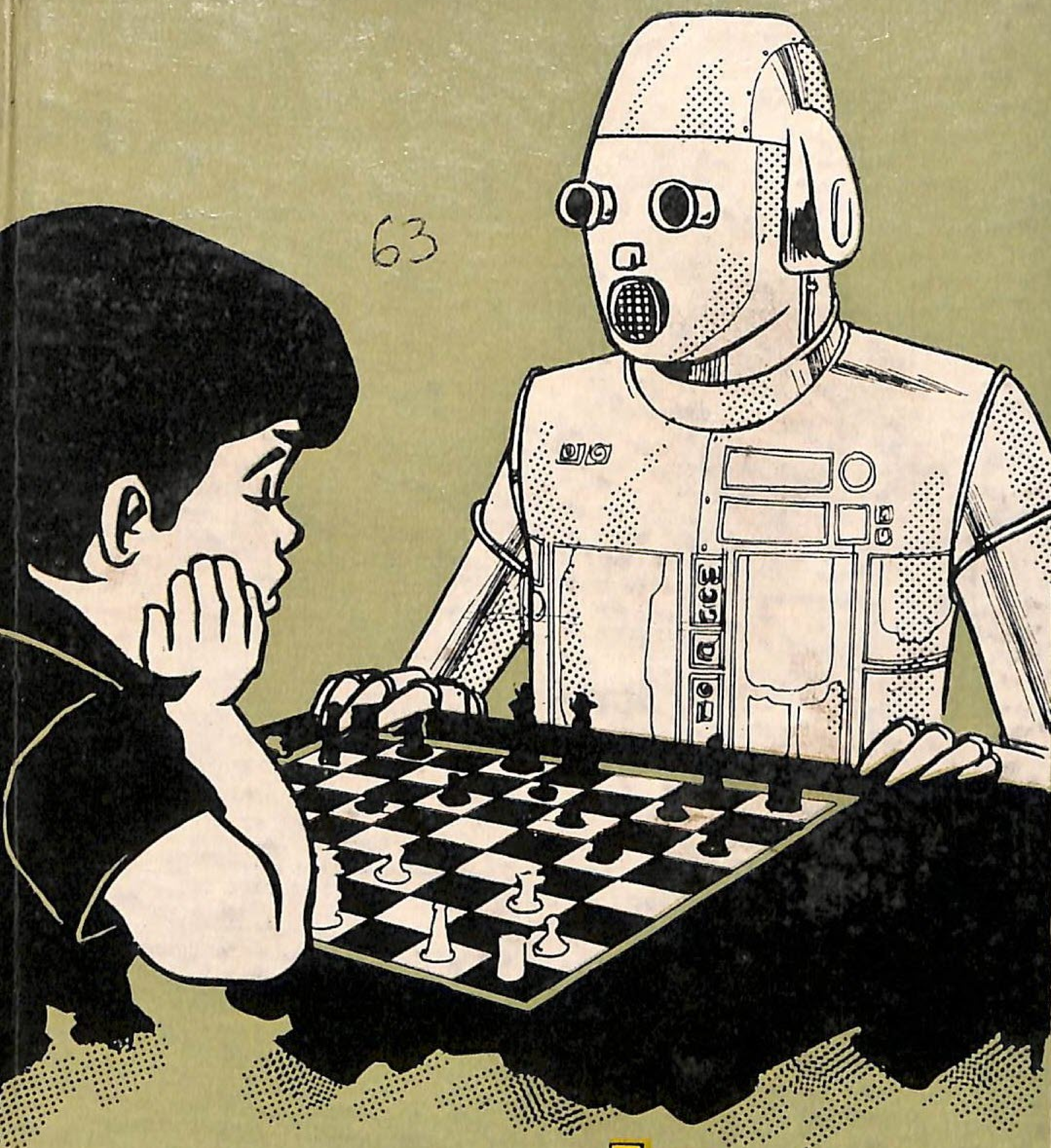


রোবট

রোবট

63

দেবব্রত মল্লিক
সম্পাদিত

মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা ১৯৮৪। প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ, মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩। মুদ্রক ঃ বাবাই পাপাই প্রেস, কলকাতা-৭৩।

প্রচ্ছদ ঃ স্বপন দেবনাথ। অলংকরণ ঃ দিলীপ শীল।

দশ টাকা।

ROBOT

Edited by : DEBABRATA MOLLICK

Rs. 10·00

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের শরীর
রোবট

বর্তমান বিশ্বে রোবট বিজ্ঞানের এক বিস্ময়। এই কৃত্রিম যন্ত্রের তৈরি শরীরটি সম্পর্কে আমাদের অন্তহীন কৌতূহল। সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। মানুষ যেখানে অসম্পূর্ণ রোবট সেখানে সার্থক। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই অসার্থক মানুষই আবার রোবটের সৃষ্টিকর্তা।

মানুষের নিজের সুবিধের জন্য সে তারই পরিপূরক একজনকে তৈরি করতে চাইল কৃত্রিমভাবে। যে ক্রমান্বয়ে দ্রুত তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। যে হবে তার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো। বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য ঘটনা।

রোবট—এই তিন অক্ষরের শব্দটির উৎস চেক শব্দ রোবট থেকে।

অর্থ হল—আজ্ঞাবহ ভৃত্য। শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন চেকোশ্লোভাকিয়ান নাট্যকার কারল চাপেক তার রোসুমস্ ইউনিভার্সাল রোবটস নাটকে। সংক্ষেপে একে বলা হয় আর ইউ আর। নাটকটির প্রথম প্রদর্শন থেকেই সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। যন্ত্রসভ্যতার প্রতি কটাক্ষপাত নাটকটির মূল বক্তব্য। এ যেন মানুষের কাছে এক নতুন জগতের উদ্ভাবন। যন্ত্র এবং মানুষের সম্পর্কের নানান ঘটনাবলী নিয়ে তৈরি হয়েছে দৃশ্যাবলী। চিত্তাকর্ষক। দর্শকদের কাছে নাটকটি ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

চাপেক জন্মগ্রহণ করেন প্রাগে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বেঁচেছিলেন মাত্র ৪৮ বছর। মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। নাটক আর ইউ আর প্রথম প্রদর্শিত হয় নিউ ইয়র্কের গেরিল থিয়েটারে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর। এখন বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পে কলে কারখানায় রোবটের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোবট নিয়ে ওয়েলডিং এর কাজ চলছে। মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। তা ছাড়াও চলছে ড্রিলিং কাটিং-এর কাজও। মানুষের অসহজ অসচ্ছন্দ জায়গাগুলোতে রোবটের দ্বিধাহীন বিচরণ। ক্রমশই বিজ্ঞানীরা রোবট নিয়ে দুর্বলতা অনুভব করছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই চাইছেন কিভাবে আরো আরো স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তোলা যায় রোবটকে। শুধু কানে শোনা বা চোখে দেখাই নয় স্পর্শ সংক্রান্ত সংবেদনশীলতাও রোবটের মধ্যে যেন থাকে সে ব্যাপারেও চেষ্টা চলছে ভীষণভাবে। হয়তো এমন একটা দিন

আসবে যেদিন পৃথিবীর কোন এক জায়গা জুড়ে সৃষ্টি হবে রোবট নগরী। রোবটই তৈরি করবে রোবট। বিজ্ঞান জগতে মানুষের এই অবদান একদিন বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবে।

রোবটের স্বয়ংক্রিয়তার ইতিহাস মোটেও নতুন নয়। বরং বেশ প্রাচীন। ভাল ভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন বস্তু বা কোন কিছু চালনা করার ইচ্ছে মানুষের অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে এই প্রয়াস বিচ্ছিন্নভাবে ছিল তাই তেমন ভাবে সবার নজর কাড়তে পারে নি। সেই প্রয়াসই সুসংবদ্ধ হয়ে বর্তমানের রোবট।

আধুনিক রোবটের অগ্রগতি সুনির্দিষ্ট ভাবে দু'টো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। —প্রাথমিক স্বয়ংক্রিয়তা, দম দেয়া পুতুল এবং শিল্প পরম্পরায় কারিগরি কুশলতায় মানুষকে রোবট সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

প্রাথমিক স্বয়ংক্রিয়তার প্রথম সূচনা হয় প্রথম শতাব্দীতে। আলেকজেন্দ্রিয়ার হিরো একজন গ্রীক পণ্ডিত তিনি তৈরি করেছিলেন একটি পাখি। ঐ পাখিটি পান করতে পারতো এবং তারপর যেত উড়ে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে হঠাৎ করেই যেন স্বয়ংক্রিয়তার দিকে ঝোঁক বেড়ে যায়। ভিয়েনা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে একজন লেখক (১৭৫৩)। যান্ত্রিক কুশলতায় এই লেখক লিখতে পারে এবং আঁকতে পারে। পীয়েরে জ্যাকয়েট ড্রজ (জন্ম ১৭২১) এবং তার পুত্র হেনরী লুইস জ্যাকয়েট ড্রজ (জন্ম ১৭৫৭)—ফ্রেঞ্চ ঘড়ি নির্মাতা, তৈরি করেছিলেন যান্ত্রিক মানুষ। এই যান্ত্রিক মানুষরা কেউ লিখতে পারে, কেউ আঁকতে পারে, এবং পারে বাজনা বাজাতে। ফ্রেঞ্চ আকাডেমির একজন সদস্য জ্যাকয়েস্ ডি ভক্যানস্ন, তৈরি করেছিলেন একটি হাঁস। পাখা ঝাপটাতে পারে হাঁসটি, জল পান করতে পারে। শস্যও সংগ্রহ করত এবং তা হজম করতে পারতো। আর একটি বিখ্যাত যন্ত্রচালিত বাঘ তৈরি হয়েছিল ভারতের কোন এক সংগ্রাহকের জন্য। (আবিষ্কারক জানা যায় নি) সেই বাঘটি ভিক্টোরিয়া এবং লণ্ডনের অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানের স্বয়ংক্রিয়তার বড় উদাহরণ পথ চলা এবং কথা বলা পুতুল।

শিল্পে স্বয়ংক্রিয়তার প্রবর্তক হিসেবে যাঁর নাম প্রথম করতে হয় তিনি হচ্ছেন আলেকজেন্দ্রিয়ার স্টোসিবিয়াল (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দ) তাঁর জলঘড়ি আবিষ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ। এ ছাড়াও স্টেসিবিয়াল স্বয়ংক্রিয় এবং মনোরঞ্জক অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। এরপর থেকে শিল্পে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে অনেকদূর পর্যন্ত। এবং ক্রমে ক্রমে এর অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান। শেষ পর্যন্ত এর শেষ কোথায় যেয়ে হবে সেই দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

আমাদের এই সংকলন শুধুমাত্র গল্পেরই সংকলন নয় এর সঙ্গে রয়েছে রোবট তৈরি হওয়ার কারিগরি তথ্য এবং প্রযুক্তি। আমরা প্রত্যেকেই যেন রোবটের যান্ত্রিক কৌশল সম্পর্কে সাধারণ ভাবে একটা ধারণায় পৌছতে পারি। এ শুধুমাত্রই গল্প নয় কিংবা কল্পনা। রোবট কঠিন বাস্তবেরই নামান্তর।

দেবব্রত মল্লিক

বিষয়সূচী

দেবব্রত মল্লিক সম্পাদিত বিজ্ঞান-বিষয়ক বই ঃ

বিজ্ঞানের গল্প
কল্পবিজ্ঞানের গল্পমালা
বিজ্ঞান কোষ [পাঁচ খণ্ডে]

গ্যালী স্লেভ

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রোবট ও যান্ত্রিক মানব সংস্থার অনুরোধে জুরিহীন আদালত-রুদ্ধ কক্ষেই বসবে ঠিক হয়। বাদী, উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি তোলেনি। তাদের রোবটবিরোধী মনোভাব শেষে বিজ্ঞানবিরোধী জিগিরে পরিণত না হয়, সে-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হুঁশ ছিল। সরকারের পক্ষে জজ হ্যারলো শ্যেন চেয়েছিলেন যাতে ব্যাপারটা ভালো ভাবে মিটে যায়। একদিকে রোবট সংস্থা অন্যদিকে শিক্ষক-সমাজ, চটবার পক্ষে দুটোই সমান বিপদের।

আদালতের কাজ শুরু হল। উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক বার্নারস এইচ, গুডফেলোকে প্রথমে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকা হলে বাদী-পক্ষের উকিল প্রশ্ন আরম্ভ করেন - অধ্যাপক গুডফেলো, আমাদের বলুন কবে এবং কিভাবে রোবট মডেল ই. জেড-২৭কে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার প্রথম প্রস্তাব আপনার কাছে আসে ?

অধ্যাপক গুডফেলোর ছোট মুখটাতে অস্বস্তির ভাব দেখা যায়।—রোবট সংস্থার গবেষণা বিভাগের কর্তা ডঃ অ্যালফ্রেড ল্যানিং-এর সাথে পড়াশুনা সংক্রান্ত যোগাযোগ অনেকদিন ধরেই আছে। গত বছর ৩রা মার্চে উনি যখন .....

অর্থাৎ ২০03 সালে ?

হ্যাঁ।

বাধা দেবার জন্য আমরা দুঃখিত। তারপর বলুন।

অধ্যাপক অল্প মাথা ঝাঁকায়। মনে মনে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে নিয়ে বলতে আরম্ভ করেন।

কিছুটা অস্বস্তির সাথেই গুডফেলো রোবটটির দিকে তাকিয়ে দেখেন। সরকারি নিয়মমত একটা শক্ত কাঠের বাক্সে শোয়ান, সাথে দুজন সশস্ত্র রক্ষী। রোবটটা যে আসছে, উনি জানতেন। তেশ্‌-রা মার্চের ভিশুয়া ফোনের পর থেকে আরো কয়েকবার সাক্ষাতে কথাবার্তা হয়েছে ডঃ ল্যানিং-এর সাথে। রোবটটিকে অন্ততঃ একবার চোখে দেখবার কথা না দিয়ে পারেন নি। বাক্স থেকে ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়ালে রোবটটিকে ভীষণ বড় মনে হয়। ডঃ ল্যানিংও একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, আনতে গিয়ে কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা কোথাও। তারপর সাদা চুলে ভরা মাথাটা ঘোরায় অধ্যাপকের দিকে।

এটাই রোবট ই· জেড-২৭, আমাদের এই ধরনের প্রথম মডেল ; আর ইনি অধ্যাপক গুডফেলো, ইজি।

আবেগহীন গলায় ইজি বলে,—নমস্কার অধ্যাপক গুডফেলো। পুরো সাতফুট লম্বা, মোটামুটি সাধারণ এক মানুষেরই মতন দেখতে। অধ্যাপক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, বিপদ-জনক নয় নিশ্চয়ই ? গলার আওয়াজে অবশ্য ততটা বিশ্বাস প্রকাশ পায় না।

আমার চেয়েও ও নিরাপদ। অহেতুক খোঁচালে আমি তোমাকে মারবার চেষ্টা করলেও করতে পারি। কিন্তু ইজিকে রাগাতেই পারবে না। তাছাড়া রোবটীয় তিনটি সূত্র তোমার ভালোই জানা আছে।

তা অবশ্য আছে। গুডফেলো বলে।

সূত্র তিনটি ওদের পসিট্রন মস্তিষ্কে চিরকালের জন্য ঢোকানো আছে। কোন মানুষেরই কোন ক্ষতি ওদের দ্বারা সম্ভব নয়।

দেখতে বেশ ভদ্র, শান্ত বলেই মনে হচ্ছে।

দেখতে যাই হোক, ইজি কিন্তু কাজের লোক।

আমাদের কি কাজে লাগবে, সেটা কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। তুমি অনুরোধ করেছিলে বলে আমি ওকে একবার অন্ততঃ দেখতে রাজি হয়েছি।

শুধু চোখের দেখা না দেখে, একটু পরীক্ষা করে দেখ। কোন বই এনেছ সাথে ?

এনেছি।

বেশ, দাও আমাকে।

অধ্যাপক রোবটটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই কাঁধের ঝোলার থেকে একটা বই বের করে দেয় ডঃ ল্যানিংকে। হাত বাড়িয়ে নেয় ডঃ ল্যানিং।

উচ্চতাপীয় অতি পরিবাহী। এতেই হবে। তুমি নিজেই এটা বেছে এনেছ। এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করিনি, ঠিক তো ?

ঠিক।

ডঃ ল্যানিং বইটা ইজির হাতে দেওয়া মাত্রই অধ্যাপকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, ওটা কিন্তু একটা অত্যন্ত দামী বই।

ভয়ের কারণ নেই। নিজের জোর দেখাবার জন্য ইজি বইটাকে দু'টুকরো করবে না। ওর হাতে বই নিরাপদ। ইজি, তোমার কাজ আরম্ভ কর।

ধন্যবাদ। শরীরটা অল্প নোয়ায় রোবটটা,—আপনার অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করছি অধ্যাপক গুডফেলো।

অধ্যাপক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বলে,—আচ্ছা ঠিক আছে।

ধীর গতিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে ইজির ধাতুর আঙ্গুলগুলো কাজ করতে থাকে। পাতার পর পাতা ওল্টাতে থাকে ইজি।

আলোটা একটু কম হচ্ছে না? অধ্যাপক প্রশ্ন করেন।

না, ওতেই হবে। উত্তর দেয় ডঃ ল্যানিং।

অতি বেগুনী রশ্মির সাহায্য নিয়েছ বোধহয়, ওর দেখবার জন্য?

তুমি ত রোবটবিদ্যার অনেকটাই জান। অন্ততঃ কাগজে-কলমে।

কি করছে ও?

ধীরে বন্ধু। একটু ধৈর্য ধর।

অবশেষে শেষপৃষ্ঠা ওল্টায় ইজি। ডঃ ল্যানিং জিজ্ঞেস করেন, কি পেলে, ইজি?

রোবট উত্তর দেয়,—এটা একটা অতি নিখুঁত বই, ভুল নেই বললেই চলে। ২৫ পৃষ্ঠার ১২ নম্বর লাইনে পরমাণুকে লেখা হয়েছে পমরাণু। ১৬২ পৃষ্ঠার ৪এর লাইনে ও ১৮৮ পৃষ্ঠার ২১ নম্বর লাইনে ব্যবহৃত কমা বসানো ঠিক হয়নি। ১১২ পৃষ্ঠার তৃতীয় সমীকরণে 'e' এর ঘাত লেখা হয়েছে ২, আসলে হবে—২, তা না হলে আগের সমীকরণগুলোর সাথে এর সঙ্গতি থাকছে না। আর পৃষ্ঠা......

দাঁড়াও, দাঁড়াও। রোবটটিকে মাঝপথে নামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন গুডফেলো—ও এসব কি করছে?

করছে? ওর করা হয়ে গেছে। ও তোমার বইটার মুদ্রণগত ভুল সংশোধন অর্থাৎ প্রুফরিডিং করে ফেলেছে।

প্রুফরিডিং করে ফেলেছে?

হ্যাঁ। বই-এর পাতা ওল্টাতে যে সময় লেগেছে তার মধ্যেই ও বইটার সমস্ত বানান, ব্যাকরণ বা যতি চিহ্নের ভুল, শব্দের অপপ্রয়োগ বা বক্তব্যের অসঙ্গতি ধরে ফেলেছে। ও সেগুলিকে নির্ভুলভাবে মনে রেখে দেবে যতদিন পর্যন্ত তোমাদের দরকার ফুরিয়ে না যাবে।

অধ্যাপক হাঁ করে চেয়ে দেখেন ইজির দিকে,—অর্থাৎ ও একটা প্রুফরিডার রোবট?

আরো অনেকরকম কাজের মধ্যে প্রুফরিডিং কাজটাও ইজি করতে পারে।

কিন্তু খোলা জায়গায় কোন রোবট দিয়ে কাজ করান আইনবিরুদ্ধ কাজ। সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে?

ওদিকটা আমরা ভালো করেই ভেবে দেখেছি। আইনের ফাঁকও আছে অনেকগুলো। খোলা জায়গায় লোকজনের মধ্যে কেন? সুবিধামত জায়গায়, ঘেরা ঘরে ওকে

রাখলেই চলবে ; ও কিছু মনে করবে না।
কিন্তু এত দাম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কি একটা রোবট কিনতে রাজি হবে ?
টাকার কথা ভেবোনা। আমরা ইজিকে তোমাদের কাছে ভাড়া দিতে চাই। বছরে মাত্র এক লাখ টাকার বদলে।
এরপর আর কথা চলে না। অধ্যাপক কথা দেন যে আগামী উপদেষ্টা পরিষদের সভাতেই তিনি কথাটা তুলবেন।



অধ্যাপক গুডফেলো তার জবান শেষ করলে বিবাদী পক্ষের উকিল জেরা শুরু করেন,—আপনি রোবটের প্রসঙ্গ সভাতে তুলবেন, একথা আগ্রহ নিয়েই বলেছিলেন তাই নয় কি ?
সেসময় রোবটসহ ডঃ ল্যানিংকে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠাতেই বোধহয় আমি সহজেই রাজি হয়ে যাই।
আপনি কিন্তু কথাটা পরের সভাতেই তুলেছিলেন ?
তা অবশ্য ঠিক।
তার মানে শুধু এড়িয়ে যাবার জন্য বা বন্ধুত্বের খাতিরেই নয়, রোবটটির কার্যক্ষমতা দেখে এবং নিরাপত্তামূলক রোবটীয় নিয়মগুলোর সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়েই তবে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়কে রোবটটিকে কাজে লাগাবার অনুরোধ করেছিলেন। তাই নয় কি ?
অধ্যাপক অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেন,—ইজির কাজ সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না কারণ……
ঠিক আছে। মাঝপথেই থামিয়ে বসে পড়েন বিবাদী পক্ষের উকিল। বোকার মতন থেমে গিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে দাঁড়ান অধ্যাপক গুডফেলো। জজ শ্যেন বলে ওঠেন,—যেহেতু আমি রোবটীয় বিজ্ঞান কিছুই জানিনা, ডঃ ল্যানিংকে অনুরোধ করব যদি তিনি আদালতের সুবিধার্থে রোবটীয় নিয়ম তিনটি উল্লেখ করেন।
ঠিক আছে, মাননীয় ধর্মাবতার। কেশে নিয়ে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে ধীরে আরম্ভ করেন ডঃ ল্যানিং,—প্রথম নিয়ম ঃ রোবট কোন মানুষকে আঘাত করবে না অথবা

নিষ্ক্রিয় থেকে কোন মানুষের ক্ষতি হতে দেবে না। দ্বিতীয় নিয়ম ঃ রোবট মানুষের আদেশ মানতে বাধ্য যদি না তাতে প্রথম নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। তৃতীয় নিয়ম ঃ রোবট সব সময়েই নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে যতক্ষণ না তার দ্বারা প্রথম বা দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।

—বুঝলাম। হ্যারলো শ্যেন কেদারায় পিঠ রাখেন,—এই নিয়মগুলো সব রোবটকেই মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া থাকে, তাই কি?

হ্যাঁ, যে কোন রোবটকে। এটা রোবট নির্মাণের গোড়ার কথা।

আপনাদের ই, জেড—২৬ মডেলকেও এটা শেখানো ছিল?

হ্যাঁ ধর্মাবতার। ডঃ ল্যানিং বসে পড়েন।



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রোবট সংস্থার সিনিয়র রোবট মনোবিজ্ঞানী ডঃ সুজান কেলভিন প্রশ্ন করেন ডঃ ল্যানিংকে – অধ্যাপক গুডফেলো সব ঠিক বলেছেন?

মোটামুটি, তবে রোবট সম্বন্ধে যতটা ভয় বা দ্বিধা ছিল বলে ধারণা দিলেন সেটা সত্যি নয়। ইজির জন্য কত ভাড়া দিতে হবে শোনার পর উনি বরং প্রচণ্ড উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।

ডঃ কেলভিন একটু ভেবে বলেন,—ভাড়াটা অত কম না রাখলেই বোধহয় ভালো হত। আমরা ইজিকে উত্তর পর্বে ঢোকানর জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম।

বড় বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। মোটে এক হাজার ডলার ভাড়াটাকে লোকে আমাদের অন্য কোন মতলব বলে ভাবতে পারে।

রোবট সংস্থার মূল অংশীদার, পূর্বতন মালিকের ছেলে স্কট রবার্টসন অসহিষ্ণু ভাবে তাকায় ডঃ কেলভিনের দিকে,—ইজিকে দিয়ে কথা বলাচ্ছেন না কেন? ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেত।

মিঃ রবার্টসন, আপনি ভালো করেই জানেন ইজিকে দিয়ে কথা বলানো এখন সম্ভব নয়।

আপনি সংস্থার মনোবিজ্ঞানী, ডঃ কেলভিন। ওকে দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করুন।

মনোবিজ্ঞানী যদি আমি হই তবে কথা বলাবার বিচার আমার ওপরেই ছেড়ে দিন। রোবটের ক্ষতি করে কথা বলতে বাধ্য আমি করব না ওকে।

রবার্টসন উত্তর হয়ত একটা দিতেন কিন্তু বিচারকের হাতুড়ির মৃদু আওয়াজে চুপ

করে যান। সাক্ষী হিসাবে এবারে আসেন ফ্রান্সিস জে হার্ট, ইংরাজির বিভাগীয় প্রধান। স্যুটেড-বুটেড শৌখীন মানুষ, কাঁচাপাকা সুবিন্যস্ত চুল পিছনের টাকটাকে ঢাকতে সচেষ্ট। প্রশ্নের উত্তরে বললেন,—রোবট ই: জেড ২৭-এর সম্বন্ধে প্রথমে শুনি অধ্যাপক গুডফেলোর মুখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সভাতে। তারপর গত বছর ১০ই এপ্রিল আবার ঐ বিষয় নিয়ে আমাদের একটি বিশেষ সভা হয় যার সভাপতি ছিলাম আমি।

সভার লিখিত কার্যবিবরণী কোথায় ?

সেই সভার কোন বিবরণী রাখবো না এটা ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল। গোপন রাখতে চেয়েছিলাম আলোচনাকে।

বেশ, আপনার বক্তব্য বলুন।

সেদিন সভাতে হাতে হাতে ঘুরছিল ইজির কাজের কয়েকটি নমুনা। ভৌতিক রসায়নের অধ্যাপক মিনোট বলেই ফেলেন,—গ্রাফটি অত্যন্ত নিখুঁত হয়েছে। অঙ্ক কষে আর আমাদের গবেষণার ইতিবৃত্ত ঘেঁটে এটাকে করতে আমাদের সময় লাগতো অন্ততঃ একমাস !

অবশেষে অধ্যাপক হার্ট বক্তব্য রাখেন,– রোবটটি রুটিন কাজগুলি অত্যন্ত নিপুণ-ভাবে করতে পারে তাতে কোন সন্দেহই নেই। এখানে আমার আগে এই কাজটি আমি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করেও কোন ভুলই পাইনি। হার্ট হাতের ভাঁজ করা কাগজটি খুলে দেখায়। কোন একটি ইংরাজি বইয়ের গ্যালিপ্রুফ। দুপাশের সাদা জায়গায় সুন্দর হাতের লেখায় কয়েকটি সংশোধন দেখান আছে। নীল কালিতে সংশোধন করা হয়েছে লেখকের ভুলত্রুটি আর লাল কালিতে মুদ্রকের গুলি।

ভুল ধরবার সত্যিই কিছু নেই। বলেন ডঃ ল্যানিং যিনি সেই সভাতে বিশেষ আমন্ত্রিত সভ্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। —অবশ্য পাণ্ডুলিপি অনুসারেই ও গ্যালি পরীক্ষা করে। আসলের বানান বা শব্দ প্রয়োগ ছাড়া অন্য ভুল ধরার ক্ষমতা ওর নেই।

তাই ত দেখছি। ও পাণ্ডুলিপিরও কয়েকটা শব্দ পাল্টেছে দেখেছি। অবশ্য ইংরাজি ভাষা এত সমৃদ্ধ আর এর নিয়মগুলোও এত নমনীয় যে এটা বলা খুবই শক্ত যে রোবটের সব শব্দচয়নগুলোই বেশি প্রযোজ্য হয়েছে।

ইজির পসিট্রনিক মস্তিষ্কে ভাষাতত্বের আধুনিকতম সব খবরই শেখানো আছে। ওর কোন শব্দচয়নেই আপনি আশা করি কোন ভুল বের করতে পারবেন না।

ডঃ মিনোট হঠাৎ বলে ওঠেন,—মানুষের রূপধারী রোবট বানানোর কি দরকার ছিল ? একটা কম্পুটার নিশ্চয়ই বানানো যেত গ্যালিপ্রুফের জন্য। তাতে রোবট সংক্রান্ত নানা জটিল আইনের মারপ্যাচে পড়তে হত না।

তা আমরা করতে পারতাম। তবে তার অসুবিধা হত এই যে গ্যালিগুলোকে কম্পুটারের বিশেষ যান্ত্রিক ভাষায় অনুবাদ করতে হত কাউকে, আর কম্পুটারের

উত্তরও একইভাবে আমাদের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হয়। এই করতে গিয়েই হয়ত আরো কয়েকটা ভুল হত। আমাদের এই রোবট শুধু মানুষের ভাষায় কথাই বলে না, এর সাথে আলোচনা তথা যুক্তি-তর্কও করা যাবে অনেকদূর পর্যন্ত।
অধ্যাপক গুডফেলো মুখ খোলেন,—আমরা সবাই যদি নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করি, ওর মাথা গুলিয়ে যাবার ভয় নেই? অসীম তথ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ওর মাথায় নেই?
অন্ততঃ পাঁচ বছর রাতদিন কাজ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ওর মাথায় আছে। তার মধ্যেই এসে আমরা ওর মাথা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবো। ভাড়া দেওয়ার পর এটা আমাদের একটা অন্যতম দায়িত্ব। অবশ্য ইজিকে মৌখিক নির্দেশ দিয়েই কাজে লাগবে না এরকম তথ্যগুলো ওর মন থেকে মুছে ফেলা যায়, তবে তাতে একটা ঝুঁকি থেকে যাবে। নির্দেশের যুক্তিতে ভুল থাকলে, যার সম্ভাবনা প্রচুর, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অথবা কম ভুলে বসবে ইজি। ঐ কাজটা আমাদের দিয়ে করানই ভালো। আমরা অন্ততঃ তাই চাইব।
আপনারা রোবটটিকে আমাদের এখানে গছাতে বেশি ব্যগ্র মনে হচ্ছে। বলেন ডঃ হার্ট,—বছরে এক হাজার ডলার সত্যিই খুব কম ভাড়া। অবশ্য আজ উত্তর-পূর্বে দিতে পারলে, কাল অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় নেবে, তাই না?
আমাদের ওরকম ভাবাটা কি অন্যায়? কলে কারখানায় কর্মী সংগঠনের প্রচণ্ড বিরোধিতা আছে। আমরা আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে অসুবিধা হবে না। ইজির কল্যাণে আপনাদের একঘেয়ে কাজগুলোর থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। বলতে পারেন ও একরকমের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে আপনাদের। আপনারা আরো সৃষ্টি-শীল কাজ করার সময় পাবেন ভবিষ্যতে।
বাদী পক্ষের উকিল তখনও প্রশ্ন করেন নি,—ডঃ ল্যানিং বিদায় নেবার পর রোবট রাখা না রাখার সিদ্ধান্তে ভোট নিয়েছিলেন কি আপনারা?
হ্যাঁ নিয়েছিলাম।
কি ফল হয়েছিল?
গরিষ্ঠ ভোট পড়ে রোবট রাখার পক্ষে।
আপনাদের মত কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে করেন?
বিবাদী পক্ষের উকিল সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে এ প্রশ্নে আপত্তি জানালে বাদী পক্ষ ঘুরিয়ে প্রশ্ন রাখেন,—আপনার নিজস্ব মত কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? আপনি বোধহয় রোবটের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন?
হ্যাঁ, পক্ষেই দিয়েছিলান। আমি ডঃ ল্যানিং-এর কথায় যথেষ্ট প্রভাবিত হই এবং মনে করি শিক্ষিত সমাজের প্রতিভু হিসাবে মানব কল্যাণের জন্য রোবটের প্রয়োগের আমাদের এগিয়ে আসা উচিত।
তার মানে আপনি ডঃ ল্যানিং-এর কথায় বিশ্বাস করেছিলেন?

বিশ্বাস না করার কোন কারণ ছিল না। আর কথা বলার কাজটি উনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছিলেন বলেই আমার ধারণা।

সাক্ষীকে আপনি জেরা করতে পারেন। বন্ধুর দিকে নির্দেশ করেন বাদী পক্ষের উকিল।

সাক্ষীর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন ছোঁড়েন বিবাদী পক্ষের উকিল, আসলে আপনারা রোবটটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নেবার জন্য উৎসাহী ছিলেন, তাই নয়?

আমরা ভেবেছিলাম ওকে দিয়ে কাজ করানো যেতে পারে।

সেকি! আপনি নিজে সেদিন ইজির কাজকর্ম পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। আপনি কি ওর কোন কাজ যথেষ্ট ভাল নয় মনে করেছিলেন?

তা…

আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি অসন্তোষজনক কোন কাজ লক্ষ্য করেছিলেন কি?

না।

আজ আমরা যা নিয়ে এখানে উপস্থিত সেই কাজটি ছাড়া ইজির ভুল হয়েছে এরকম কোন কাজ আপনার জানা আছে?

না, আমার জানা নেই।

কেশে পরিষ্কার করে প্রসঙ্গান্তরে যান বিবাদী পক্ষ, —ভোট-প্রসঙ্গে আপনি গরিষ্ঠতার কথা বললেন। ঠিক কত ভোট পক্ষে এবং বিপক্ষে পড়ে?

তের জন পক্ষে আর বিপক্ষে একজন।

তের আর এক! এটাকে শুধুই গরিষ্ঠ বলা যায় কি?

গরিষ্ঠ বলতে অর্ধেকের বেশি বোঝায়। চোদ্দর মধ্যে তের গরিষ্ঠ বইকি!

একে তো প্রায় ঐক্যমত বলা চলে।

না, একে গরিষ্ঠতাই বলব আমি।

একমাত্র বিরোধী ব্যক্তিটি কে জানতে পারি?

অধ্যাপক হার্ট একটু অস্বস্তিবোধ করেন বোধহয়। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেন, অধ্যাপক সাইমন নিনহাইমার।

অধ্যাপক নিনহাইমার? সমাজবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান? বিস্ময়ের ভান করেন উকিল।

হ্যাঁ।

অর্থাৎ এই বিচারের যিনি বাদী?

হ্যাঁ।

তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে, যে ভদ্রলোক আমার মক্কেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রোবট ও যন্ত্রমানব সংস্থার কাছে সাড়ে সাত লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রথম থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবট ব্যবহারের বিরোধিতা করে গেছেন, যদিও উপদেষ্টা পরিষদের বাকি সবাই রোবট ব্যবহারের পক্ষেই মত

দিয়েছিলেন।
তিনি বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। সেটা তার স্বাধীনতা।
উনি কি কোন বক্তব্য রেখেছিলেন?
বোধহয় কিছু বলেছিলেন।
বোধহয়?
হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন।
রোবট ব্যবহারের বিরুদ্ধে?
হ্যাঁ।
আপনি অধ্যাপক নিনহাইমারকে কতদিন ধরে চেনেন?
প্রায় বার বছর।
আপনি কি মনে করেন অধ্যাপক নিনহাইমার সেই ধরনের লোক যে সেদিন ভোটে হেরে গিয়েছিলেন বলেই শেষ অবধি উনি রোবটটির প্রতি ···
বাদী পক্ষের উকিলের সগর্জন আপত্তিতে প্রশ্ন মাঝপথেই বন্ধ হয়। বিবাদী পক্ষ আর প্রশ্ন না করাতে অধ্যাপক হার্টের সাক্ষ্য শেষ হয়, আর সাথে সাথেই মধ্যাহ্ন বিরতি ঘোষণা করেন জজ সাহেব।



সাড়ে সাত লক্ষ ডলার রোবট কোম্পানির কাছে বড় কথা নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হেরে গেলে দীর্ঘদিনের জন্য এর ফল ভুগতে হবে। সাধারণ মানুষের রোবট সম্পর্কে অকারণ ভীতি আছে এমনিতেই। রবার্টসন ব্যাজার মুখে প্রশ্ন করেন,—ইজিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকানর ব্যাপারে এতসব কথা হচ্ছে কেন?
সপক্ষের উকিল উত্তর দেন,-আদালতের কাজকর্ম অনেকটা দাবা খেলার মত। আগের থেকে যে যত ভাল চাল বুঝতে পারবে তারই জিত। আমার বন্ধুটি এ খেলায় নতুন নন। ওঁরা বোধহয় ভাবছেন আমাদের একমাত্র কৈফিয়ত হবে রোবটীয় নিয়ম তিনটি, অর্থাৎ আমাদের রোবট অন্যায়টি করতেই পারে না।
সেটাতো সত্যি বটেই, একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য।
একজন রোবটবিজ্ঞানীর পক্ষে হয়ত সত্যি, কিন্তু একজন বিচারকের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। প্রতিপক্ষ বোঝাতে চেষ্টা করবে যে এই রোবটটি অন্য সাধারণ রোবটের মতন নয়। একদম নতুন ধরনের তাই আপনারা এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিয়ে

নেওয়ার জন্য এত চেষ্টা করেছিলেন। এরপর ওরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে যে মডেলটি নির্ভুল হয়নি। এখন বুঝতে পারছেন এত সব কথা হচ্ছে কেন ?
রবার্টসন হাল না ছেড়ে বলেন, কিন্তু ই. জেড-২৭ মডেল নির্ভুল ভাবে তৈরি। প্রথম ২৬টি বাদ দিয়ে তবেই আমরা এটাকে দাঁড় করিয়েছি।
প্রথম ২৬টিকে বাদ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ কোন খুঁত ছিল ওদের মধ্যে। তবে ২৭-তমটিতে ভুল থাকতে পারে না কেন ?
আগের ২৬টিতে ভুল মোটেই ছিল না। ওদের মস্তিষ্কগুলো যথেষ্ট জটিল হয়নি বলে আমরা ওদের গ্রহণ করিনি। কোন রোবটই অত খারাপ হতে পারে না যে রোবটীয় নিয়ম তিনটি তারা মানবে না।
ডঃ ল্যানিং এ সবই আমাকে বলেছেন। কিন্তু বিচারক এগুলো বিশ্বাস করতে রাজি নাও হতে পারেন।
যদি ইজি কোন কথা বলত ! রাগে গজরাতে থাকেন রবার্টসন।
রোবটের সাক্ষ্যের কোন মূল্যই কিন্তু নেই।
অন্ততঃ ব্যাপারটা কি সেটা জানা যেত। ইজি কেন একাজ করল ?
ডঃ সুজান কেলভিন আর নিজেকে চুপ করে রাখতে পারেন না। প্রায় রাগতঃ স্বরেই বলে ওঠেন,—ইজি কেন একাজ করল সেটা আমাদের জানা আছে। ওকে আদেশ করা হয়েছিল। একথা তো আমরা আগেই আলোচনা করেছি।
রবার্টসন আবাক হয়। তাকে একথা এতদিন কেউই বলেনি ! কি মনে করে এরা নিজেদের ? কোম্পানির মালিক ? কথা খুঁজতে থাকেন রাগ চাপতে গিয়ে, কে, কে আদেশ করেছে ?
অধ্যাপক নিনহাইমার। অতি ছোট্ট উত্তর ডঃ কেলভিনের।
কিন্তু কেন ?
সঠিক বলা মুস্কিল। মামলা ঠুকে টাকা পাওয়ার জন্যেও হতে পারে।
তাই যদি হবে, ইজি বলছে না কেন ? আবার অবাক হয় রবার্টসন।
সহজ কথা। ওকে হয়ত বলা হয়েছে ও এ বিষয়ে যা জানে তা প্রকাশ করলে কোন মানুষের ক্ষতি হবে। রোবটীয় নিয়ম অনুযায়ী ওকে চুপ থাকতেই হয়েছে।
ডঃ কেলভিনের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা দেখতে পেয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন রবার্টসন, আর, ও চুপ থাকলে রোবট কোম্পানির যে সমূহ বিপদ সেটা ওকে বোঝাতে পারছেন না কেন ?
কারণ ওর কাছে রোবট কোম্পানি কোন মানুষ নয়। যিনি নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কেউ যদি ওকে অন্যরকম বোঝাবার চেষ্টা করে, ওর মস্তিষ্কের প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারে, আর তা আমি হতে দেব না।
ডঃ ল্যানিং আবহাওয়া স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করেন,—আমার মনে হয় আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে অভিযোগটি আনা হয়েছে, কোন রোবটই তা করতে পারে না।

বিরক্তভাবে রবার্টসন বলেন, আপনারা যা সব বলেছেন, তাতে প্রমাণ করবেন যে কিভাবে তাতো বুঝতে পারছি না।

ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে বিচার আবার শুরু হয়। সাক্ষী হিসাবে হাজির হন অধ্যাপক সাইমন নিনহাইমার স্বয়ং। অধ্যাপকের মাথায় উস্কো-খুস্কো কাচাপাকা চুল, টিকালো নাকের নিচে ভরাট চিবুক। কথা বলার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলবার আগে একটু থমকে দাঁড়ানোটা ওর বদভ্যাস। শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হ'ল কিনা অথবা অর্থ কি দাঁড়াবে সেটা বোধহয় বুঝে নিতে চান বলবার আগে।
বাদী পক্ষের উকিল শুরু করেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটটির কাজ করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ?
হ্যাঁ।
কেন, বলবেন কি ?
আমার মনে হয়েছিল রোবট কোম্পানির, উ . উদ্দেশ্য ঠিক কি ছিল, তা আমরা ধরতে পারিনি। ওদের অতিরিক্ত উৎসাহ আমার ভাল লাগেনি।
ওর কাজ সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ হয়েছিল ?
ও যে ঠিকমত কাজ করতে পারেনি সেটা তো হাতে-নাতে প্রমাণিত।
একটু খুলে বলুন।
অধ্যাপক নিনহাইমারের জীবনের সবচেয়ে দামী কাজ হল তাঁর সাম্প্রতিকতম বই "মহাকাশ যাত্রা ও সামাজিক টানা পোড়েন," যেটা উনি প্রায় গত আট বছর ধরে লিখেছেন। আর স্বভাব অনুযায়ী লেখাটাকে উনি কাটা ছেঁড়া করছিলেন আর সাথে সাথে আধুনিক তথ্য যোগ করছিলেন এতদিন ধরে। সমাজবিদ্যা বিভাগের অপর শিক্ষক সহ অধ্যাপক জিম বেকার বইটার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন অধ্যাপক নিনহাইমারকে। গ্যালিপ্রুফের একটা থাকত বেকারের কাছে, একটা নিনহাইমারের কাছে। আলাদা ভাবে পরীক্ষা করার পর দুটো মিলিয়ে তৃতীয়টিতে শেষ কাটাকুটি করতেন।
যখন এই রকম চলছে, একদিন বেকার এসে বললেন,—প্রথম পরিচ্ছদ দেখে ফেলেছি। কয়েকটা মুদ্রণ সংক্রান্ত ভুল ছিল কেবল।
প্রথম পরিচ্ছদে ওরকম দু-চারটে থাকেই। নির্লিপ্তভাবে বলেন অধ্যাপক নিনহাইমার।
আপনি আমার প্রুফটা দেখবেন কি ?
থাকগে। আমারটায় আমি আর কিছু করিনি। ভাবছি বৃথা খাটবো না আর।
তার মানে ? বেকার আকাশ থেকে পড়ে।
আমি যন্ত্রনার কিছু··· সময়, হ্যাঁ কিছু সময় চেয়েছি। প্রুফ-রিডার হিসাবেই ওকে এখানে প্রথমে আনা হয়েছিল।

যন্ত্র, আপনি ইজির কথা বলছেন ?
যন্ত্রর ওরকম একটা নাম, বড়ই বোকা বোকা।
কিন্তু আপনি ওর সাহায্য নেবেন না বলেই আমাদের ধারণা ছিল।
বোধহয় আমিই একমাত্র লোক যে ওর, ...ওর সাহায্য নিচ্ছি না।
আমি মিছেমিছি খাটলাম এতটা। বেকারের গলায় বিরক্তির আভাস স্পষ্ট।
মিছেমিছি নয়। আমরা তোমার প্রুফের সাথে যন্ত্রটার প্রুফ মেলাতে পারব।
আপনি যদি ওর কোন ভুল ধরবেন আশা করেন, তবে···
তবে ?
ইজির কাজে এ অবধি কেউ কোন ভুল পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।
হয়ত তাই। অধ্যাপক আর কথা বলার সুযোগ বন্ধ করেন।
দিন চারেক পর দ্বিতীয় গ্যালিটি ইজির কাছ থেকে প্রুফ করিয়ে উত্তেজিতভাবে বেকার ঢোকে নিনহাইমারের ঘরে,—আমার ধরা ভুলগুলো ছাড়াও আরো গোটা দশেক ভুল বের করেছে ইজি, মোট সময় নিয়েছে বারো মিনিট !
নিনহাইমার কাগজগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে বলেন,—যাই বল, আমাদের মতন সম্পূর্ণ কাজ কিন্তু ও করতে পারে না। আমরা হলে এখন মস্তিষ্কের ওপর অভিকর্ষহীনতার প্রভাব সম্বন্ধে সুজুকির আধুনিক কাজটার একটা উল্লেখ নিশ্চয়ই করতাম।
সমাজবার্তায় প্রকাশিত সুজুকির প্রবন্ধের কথা বলছেন ?
ঠিকই বলেছ।
কিন্তু আপনি ইজির কাছে অসম্ভব কাজ আশা করছেন কি ভাবে। ও আমাদের হয়ে বই পড়া অর্থাৎ গবেষণার কাজ করতে পারে না।
তা বটে। সুজুকির কাজের ওপর একটা টুকরো লেখা আমি তৈরি করেও রেখেছি, মূল লেখার মধ্যে জায়গামত ঢোকানর জন্য। আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখতে চাই যে ও লেখার মধ্যে ঢোকানোর·· ঢোকানোর কাজটা ঠিকমত করতে পারে।
আমি নিশ্চিত যে ও পারবে।
আমি নিজে দেখে নিশ্চিত হতে চাই।
এরপর অধ্যাপক নিনহাইমার নিজে একদিন ইজির কাছে উপস্থিত হন। ঢোকানর কাজটা বুঝতে ইজির কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না। রোবটের এত কাছে এসে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেন নিনহাইমার। অবশেষে প্রায় নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করেন,—কাজ করতে কেমন লাগছে ?
খুব ভালো, অধ্যাপক নিনহাইমার।
আমাকে চিনলে কি করে ?
গ্যালিতে নতুন তথ্য ঢোকাচ্ছেন, তার থেকেই বোঝা যায় আপনিই এর বইয়ের লেখক। আর লেখকের নাম গ্যালির প্রত্যেক পাতার উপরেই মুদ্রিত আছে।

আরে, তুমি দেখছি ...যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার।
নিনহাইমার আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না,—আমার বইটা এ অবধি তোমার কেমন লাগছে?
খুব আরামদায়ক।
আরামদায়ক? তোমার মুখে কথাটা বেমানান লাগছে। আমি জানতাম তোমার কোন আবেগ অনুভূতি নেই।
আপনার বইয়ের বিষয়বস্তু আমার মাথার পসিট্রনবাহী স্নায়ুতে কোন রকম চাপ সৃষ্টি করছে না, তাই বললাম আরামদায়ক। আবেগ বা অনুভূতির কোন ব্যাপার নয়।
বুঝলাম। বইটাকে আরামদায়ক মনে হচ্ছে কেন?
কারণ এর বিষয়বস্তু মানুষ, রসায়ন বা অঙ্কের সাংকেতিক চিহ্ন নয়। আপনার বই মানুষ নিয়ে, তাদের উন্নতির কথা নিয়ে।
আর তোমার নির্মাতাদের নির্দেশমত তুমিও মানুষের সুখ কামনা কর, সেইজন্যেই এই বইটা তোমার ভালো,......আরামদায়ক মনে হচ্ছে। তাই কি?
হ্যাঁ তাই, অধ্যাপক নিনহাইমার।
পনের মিনিটের মাথায় অধ্যাপক ইজির ঘর থেকে বাইরে আসেন।
দু-একটা তথ্য ঢোকান ছাড়া অধ্যাপক এরপর আর গ্যালিতে হাত দেননি। ইজির কাছ থেকে ফিরে আসা গ্যালি চলে গেছে ছাপাখানায়। প্রথম দিকে নিনহাইমার একটু আধটু দেখে নিতেন, শেষের দিকে একদম না। বেকারের খুব ভালো লাগেনি ব্যাপারটা। মাঝে একবার ইজির হাত থেকে গ্যালি নিয়ে ছাপাখানায় দেবার আগে পড়তে বসে বেকার। ভুলটুল ধরা ছাড়াও একটি মাত্র কথার পরিবর্তন করেছে ইজি। অপরাধী শব্দটার বদলে বেহিসেবী কথাটা বসিয়েছে।
অধ্যাপক নিনহাইমার এবং বেকার দুজনেই স্বীকার করেন যে শব্দর চয়ন ঠিকই হয়েছে। উপরন্তু অধ্যাপকের মৃদু গালি খায় বেকার, অহেতুক সময় নষ্ট করছে বলে। অন্য কোন কাজ শুরু করবার নির্দেশ পায় বেকার।
৮ই মে-তে বইটির প্রথম কপিটি হাতে পান অধ্যাপক। দু-একবার উল্টেপাল্টে সরিয়ে রাখেন বইটা। এরপর অন্য জরুরী কাজে একদম ভুলে যান বইটার কথা। এমনকি বেকারকে একটা কপি দেবার কথাও মনে থাকে না।
১৬ই জুন থেকে আরম্ভ হয় ঘটনা। সেদিনই নিনহাইমার ভিশ্-ফোন পান তাঁর বন্ধু অধ্যাপক স্পাইডেলের কাছ থেকে। ছবিতে স্পাইডেলের মুখের ভাব দেখে অবাক হন তিনি।
কোথা থেকে বলছ? এখানে এসেছ নাকি?
না, ক্লিভল্যান্ড থেকে বলছি। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?
কেন বলত? খুব রেগেছো মনে হচ্ছে?

তোমার নতুন বইটা দেখেছো নিজে ? ভুলে ভর্তি। ৫৬২ পৃষ্ঠায় আমার তত্ত্বকে তোমার মতন করে বোঝাবার দায়িত্ব কে দিয়েছে তোমাকে ? ৬৯০ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক ইপার্টিয়েভের সূত্রকে পুরো উল্টে দিয়েছ। আর কত বলব। দাঁড়াও পড়ে শোনাচ্ছি তোমায়...

দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে বইটা আনতে দাও। হায়। ভগবান, একি বলছ সব ? দেরাজ খুলে বই নিয়ে এসে বসেন নিনহাইমার ভিশ-ফোনের সামনে।

কি দেখছ ?

সত্যি বলছি স্পাইডেল, এগুলো আমার লেখা নয়।

অথচ ছাপার অক্ষরে লেখা আছে তোমার বইতে। এক্ষুনি তুমি বাদবাকি বই তুলে নিতে বল বাজার থেকে। আগামী সম্মেলনে তোমাকে কিন্তু বিপদে পড়তে হবে, বলে দিচ্ছি। পর্দাতে স্পাইডেলের ছবি মিলিয়ে যায়।

পুরো বইটা এরপর পড়েন নিনহাইমার, আর পাতার নম্বর হিসাব রাখেন।

ইজির ঘরে যখন ফের ঢোকেন নিনহাইমার, অতিকষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রাখেন তিনি, পৃষ্ঠা ৫৬২, ৬৩১, ৬৬৪, ৬৯০ পড়তে অনুরোধ করছি তোমায়।

প্রত্যেকটি পাতাই আমার মাথায় আছে, বলুন কি জানতে চান ?

আমার পাণ্ডুলিপিতে ঠিক এররকম ছিল কি ?

আজ্ঞে না।

তুমি কি গ্যালিতে পরিবর্তন করেছিলে, এখন যেমন আছে সেইরকম ?

হ্যাঁ।

কেন ?

আমার মনে হয়েছিল ঐসব জায়গায় কিছু কিছু কথা কোন কোন মানুষ বা মানব জাতির ওপর বড় কড়া হয়েছে। এর ফলে তাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও আছে। তাই ঐসব জায়গায় আমি প্রয়োজনমত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলাম।

জীবনের শেষ বৃহৎ গবেষণার কাজে এতবড় ক্ষতি একেবারে ভেঙ্গে দেয় নিনহাইমারকে আর তার ফলস্বরূপ আজকের বিচার সভা।

বাদী পক্ষের উকিলের প্রশ্নের উত্তরেই অধ্যাপক কথাগুলো বলেন।

বাদী পক্ষের তখনও প্রশ্ন শেষ হয়নি,—তাহলে রোবট ই. জেড-২৭ নিজেই আপনাকে বলেছিল যে রোবটীয় প্রথম নিয়ম অনুযায়ীই ও আপনার বইয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছে ?

হ্যাঁ, একথা সত্যি।

ওরকম না করে রোবটের উপায় ছিল না ?

তাই দাঁড়ায় বটে।

অর্থাৎ রোবট সংস্থা প্রুফ-রিডার বলে এমন একটি রোবট বাজারে ছাড়ছেন যা নিজের ইচ্ছামত লেখকের বক্তব্য পাল্টে দিতে পারে।

প্রতিবাদীর প্রবল আপত্তিতে বিচারক আগের কথা নথীভুক্ত না করলেও, বাদীর যা বোঝাবার তা বিচারকের মাথায় ঢুকেছে বলেই বোধ হল। জেরা শুরু করবার আগে পাঁচ মিনিটের সময় চেয়ে নেন বিবাদী পক্ষের উকিল। ডঃ কেলভিনের কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করেন,—অধ্যাপক কি সত্য বলছেন? ইজি কি প্রথম নিয়ম মত এরকম করতে পারে?

রাগে ঠোঁট কামড়ায় ডঃ কেলভিন,—না, এরকম মোটেই সম্ভব নয়।

নিনহাইমারের শেষের দিকের সাক্ষ্য বেমালুম মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। সমাজবিদ্যা বিষয়ক তত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বুঝে কাজ করবার মতন করে ইজির মস্তিষ্ক তৈরি হয়নি। হয়ত আপনার কথা ঠিক, কিন্তু সাধারণ একজনকে এটা বোঝান শক্ত।

প্রমাণ করাটা সত্যিই শক্ত। আমাদের উচিত অধ্যাপক নিনহাইমার যে মিথ্যা কথা বলেছেন এটা প্রমাণ করা। আমাদের লাইন বদলাবার কোন কারণ দেখছি না।

ঠিক আছে। আমরা আগের লাইন মতই এগোবো।

উকিল অধ্যাপকের দিকে ফিরে ধীর গলায় আরম্ভ করেন,—আপনি ছাপাখানায় যাবার আগে প্রুফ-গ্যালি দেখতেন না?

প্রথমে দেখতাম, পরে আর নয়।

আপনার কথা মত, আপনারই সহকারী অধ্যাপক জিম বেকার একবার একটা ভুল ধরেছিলেন গ্যালিতে?

হ্যাঁ।

তারপরও আপনি আর দেখবার প্রয়োজন মনে করেননি?

আমি রোবট কোম্পানির কথায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম।

আপনি মিষ্টার বেকারকে তিরস্কার করেন ইজির দেখা গ্যালি পুনর্বার দেখার জন্য?

না, তা ঠিক নয়। আমার মনে হয়েছিল যে,... মিথ্যা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

আপনি আপনার বইয়ের একটি খন্ডও মিঃ বেকারকে দেননি? একটু গলা তোলেন উকিল,—কেন দেননি?

একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

প্রায় একবছর নির্ভুল ভাবে কাজ করার পর আপনার বেলাতেই ইজি ভুল করতে আরম্ভ করল। এ ব্যাপারটা কি আপনার অদ্ভুত মনে হয়নি?

আমার মনে হয়, এতদিনের মধ্যে আমার বইটাই মানুষ সংক্রান্ত আর তার থেকেই রোবটীয় নিয়মগুলি হয়ত ওর বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

আপনি অনেক সময়ই বেশ রোবট বিশেষজ্ঞের মত কথা বলছেন, অথচ আপনিই প্রথমে রোবটের বিরোধিতা করেছিলেন। আমি যদি বলি, আপনিই আপনার ইচ্ছামত বইটার জায়গায় জায়গায় বদলে দিয়েছিলেন?

আমি, আমি…। তোতলাতে থাকেন নিনহাইমার। —কি অবাস্তব কথা! আমার গ্যালিগুলো রয়েছে।

বাদী পক্ষের উকিল মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে নিনহাইমারের গ্যালি আর রোবটের দেখা শেষ গ্যালি পরীক্ষা করা হোক। প্রতিবাদীর উকিল বিরক্ত ভাবে বলেন, – তার দরকার নেই। ও দুটোর মধ্যে ফারাক থাকবে আমি জানি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মিঃ বেকারের গ্যালি সম্বন্ধে। সেটা কোথায়?

জিমের গ্যালি? ঢোক গেলেন অধ্যাপক।

হ্যাঁ। আপনার সাক্ষ্যে তার উল্লেখ আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। রোবটের কাছে যাবার পর অবশ্য ওগুলোর আর দরকার ছিল না।

সুতরাং ওগুলো পুড়িয়ে দিয়েছেন বোধহয়?

না, ফেলে দেই।

পুড়িয়ে দেন, আর ফেলে দেন, একই কথা। মোদ্দা কথা ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তাতে অন্যায়টা কোথায়? প্রায় বোকার মত প্রশ্ন করেন নিনহাইমার।

উকিল গর্জন করে ওঠেন, – অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন না? যদি বলি আপনি আপনার গ্যালিতে জায়গায় জায়গায় পরিবর্তন করেছিলেন, এবং পরে মিঃ বেকারের গ্যালি থেকে নিয়ে সেই পাতাগুলো বদলে রেখেছেন? আর এর ফলেই আপনি রোবটকে দিয়ে এমন সব পরিবর্তন করে………

প্রচণ্ড ভাবে বাধা দেয় বাদী পক্ষের উকিল। বিচারক প্রশ্ন করেন বিবাদী পক্ষকে, —আপনি যে অভিযোগ করছেন তার কোন প্রমাণ আছে?

না, প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই, মাননীয় বিচারক। কিন্তু আপনাকে অনুধাবন করতে বলছি ঘটনা-পরম্পরাকে, প্রথমে অধ্যাপক নিনহাইমার একজন রোবটবিদ্বেষী, পরে রোবট সম্বন্ধে আগ্রহশীল এবং অতিরিক্ত বিশ্বাস। শেষ গ্যালি দেখতে দিতে অনিচ্ছুক এবং বই বেরোবার পরে বই সম্বন্ধে অনীহা এবং কাউকে তা দেখতে না দেওয়া সবই একটিমাত্র সিদ্ধান্তের দিকে…….

বিচারক বাধা দেন, – এখানে আপনার অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিচার চলতে দিতে পারি না। কারো সম্বন্ধে অভিযোগ আনতে হলে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। তা না হলে আপনাকে এভাবে বলতে দিতে পারি না।

আমার আর কোন প্রশ্ন নেই, মাননীয় বিচারপতি।

রবার্টসন হতাশ ভাবে মাথা নাড়ায়,—কি লাভ হল? বিচারক আমাদের আরো বিপক্ষে চলে গেলেন।

তা হয়ত কিছুটা সত্যি, কিন্তু মক্কেলও ঘাবড়ে গেছেন খুব। কাল সকালে বুঝতে

পারবেন লাভটা। গম্ভীর গলায় জবাব দেন উকিল।

ডঃ ল্যানিং সায় দেন ঘাড় নেড়ে। সেদিন আর বিশেষ কিছু ঘটে না। জিম বেকারের সাক্ষ্য লওয়া হয় আর হাজির হন অধ্যাপক স্পাইডেল ও ডঃ ইপাটিয়েভ। তাঁদের মতে ভুলগুলির ফলে অধ্যাপক নিনহাইমারের খ্যাতি ও সুনামের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। নজীর হিসাবে বই ও গ্যালি পেশ করা হয়। পরের দিন বসবে এই ঘোষণা করে সেদিনের মত বিচারসভা শেষ হয়।



পরের দিন শুরুতেই বিবাদী পক্ষ রোবট ই· জেড-২৭-কে দর্শক হিসাবে উপস্থিত করতে চায়। প্রচুর বাকবিতণ্ডার পর বিচারক ইজিকে উপস্থিত করার অনুমতি দেন, তবে কেবলমাত্র দর্শক হিসাবে। আইনমতে রোবটকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাঠের বাক্স খুলে, ইজিকে হাত ধরে নিয়ে আসেন ডঃ ল্যানিং। একটা চেয়ারে সাবধানে বসে ও। শব্দ করে উঠলেও ভেঙ্গে পড়ে না চেয়ারটা। উকিল শুরু করেন ঃ

এটাই যে ই· জেড-২৭ রোবট, সময়মত তার প্রমাণ উপস্থিত করব, মাননীয় বিচারপতি।

হ্যাঁ, সেটার দরকার হবে। বলেন জজ শোন।

আমার প্রথম সাক্ষী হিসাবে অধ্যাপক সাইমন নিনহাইমারকে ডাকছি।

আপনি বাদীকে আপনার সাক্ষী হিসাবে ডাকছেন? বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারক।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ, আপনার যেমন ইচ্ছা।

অধ্যাপক শপথ পাঠ করে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। আজ তাঁকে আরো বিব্রত মনে হচ্ছিল। উকিল অতি নরম ভাবে আরম্ভ করলেন,—অধ্যাপক, আপনি আমার মক্কেলের নামে সাড়ে সাত লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে অভিযোগ করেছেন?

হ্যাঁ। সাড়ে সাত লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণই চেয়েছি।

কিন্তু সেটাতো অনেকগুলো টাকা।

আমার ক্ষতিও হয়েছে অপরিসীম।

কিন্তু বইটা ছাপাতে কতই বা লেগেছে। হাজার পঞ্চাশের বেশি নিশ্চয়ই নয়।

কাগজ কলমের দাম দিয়ে এটার দাম বুঝবার চেষ্টা করবেন না। এই বইটাই আমার

জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হতে চলেছিলো, অথচ এর জন্যই আজ আমি,……আমি অবজ্ঞার পাত্র। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে আমার।

অধ্যাপকের কথায় কোন বাধা দেয় না উকিল। কথা শেষ হলে বলেন,—কিন্তু তা হলেও সাড়ে সাত লক্ষ ডলার বড় বেশি হচ্ছে না কি? আপনার বাকি জীবনে আপনি এর এক-চতুর্থাংশও রোজগার করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আপনি বড় বেশি দাবি করছেন।

নিনহাইমার আরো আবেগে বলতে শুরু করেন,—শুধু এ জীবনে নয়, ভবিষ্যতে আরো কত বছর আমার নামে নিন্দা করবে সুধীজনেরা। আমার এতদিনের খ্যাতি ও গবেষণা চিরদিনের মত লুপ্ত হবে, শুধু মৃত্যু পর্যন্ত নয়, তার পরেও, কারণ লোকেরা কোনদিনই বিশ্বাস করতে চাইবে না যে একটা রোবট ভুলগুলো ঘটিয়েছিল………

কথার মাঝখানেই ইজি উঠে দাঁড়ায়। ডঃ ল্যানিং তাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করেন না। পরিষ্কার কণ্ঠে ইজি বলে ওঠে,—আমি আপনাদের কাছে এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে বইয়ের পার্থক্যগুলি আমিই ঢুকিয়েছিলাম, যেগুলি পাণ্ডুলিপিতে………

বাদী পক্ষের উকিলও এতটা হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন যে ইজির কথায় বাধা দিতে দেরী করে ফেলেন, আর তার মধ্যেই মরীয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠেন অধ্যাপক,—তোকে ও বিষয়ে চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তবুও………। হঠাৎ চুপ করে যান অধ্যাপক। ইজি ইতিমধ্যে চুপ করে বসে পড়েছে। বাদী পক্ষের উকিল পুরো ব্যাপারটা আইনবিরুদ্ধ বলে আপত্তি তোলেন। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বিচারকের প্রশ্নে স্বীকার করতে বাধ্য হন নিনহাইমার যে ভুল পংক্তিগুলো তিনি ইজিকে দিয়ে শেষ গ্যালিতে মাঝে মাঝে ঢুকিয়েছিলেন আর সে সম্বন্ধে ওকে নির্বাক থাকার নির্দেশও তিনিই দেন।

বিচারক রায় দেন,—এটা পরিষ্কার যে অধ্যাপক নিনহাইমারের নির্দেশেই রোবট ভুলগুলি গ্যালিতে প্রবেশ করায়। এটা অধ্যাপকের একটি দুর্বোধ্য জালিয়াতি যার জন্য আজ ওনার সুনাম ও যশ ধুলোয়ে লুণ্ঠিত……

রায় রোবট সংস্থার দিকে যায়, বলাই বাহুল্য।

ডঃ সুজান কেলভিন অধ্যাপক নিনহাইমারের বাড়িতে হাজির হন রায় বেরোবার দুদিনের মধ্যে। অধ্যাপক মালপত্তর বাঁধা-ছাদা করছিলেন। গতকালই কাজে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।

আমি কোনরকম সান্ত্বনা দিতে আসিনি। সমস্ত ব্যাপারটাই আপনার কাজের ফল। আমরা অবশ্য আপনার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোন বদলী মামলা করব না,

বরং আপনার যাতে জেল না হয় তার চেষ্টাই করব।
মিথ্যা সাক্ষ্যের পরও জেলে পোরেনি। বোধহয় সেই জন্যই। নতুন মামলা আপনারা করবেনই বা কেন। আপনাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরিই পূরণ হয়েছে।
তা ঠিক। ইজিকে রেখে দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, কিছুটা বর্ধিত ভাড়াতে। আশা করি এরপর আরো দুচারটে রোবট আমরা বেচতে পারব নানা প্রতিষ্ঠানে।
তবে আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন কেন ?
কারণ আপনার রোবট ঘৃণার কারণটা পুরো বুঝতে পারিনি। বিচারে জিতলেও আপনার সুনামের হানি হতই। শুধুমাত্র রোবট বিরোধিতা থেকেই কি আপনি এত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন ?
মানুষের মন সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল কিছু আছে ডঃ কেলভিন ? প্রায় উপহাসের সুর নিনহাইমারের গলায়।
রোবট মনোবিজ্ঞানী হবার জন্য যতটুকু মানুষের মন জানা দরকার ততটুকু। মনুষ্য মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু আমাকে জানতেই হয়েছে।
আমাকে বোকা বানানোর পক্ষে অবশ্য যথেষ্টই।
সেটা মোটেই কোন শক্ত ব্যাপার ছিল না। আমার ভয় ছিল সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে ইজির কোন ক্ষতি না হয়।
মানুষের বদলে একটা যন্ত্র নিয়ে চিন্তা করা আপনার মত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ডঃ কেলভিন মোটেই বিচলিত বোধ করেন না। ধীরে উত্তর দেন,—সেটা আপনার মনে হতে পারে। আমার মতে রোবট সম্বন্ধ চিন্তা করলেই একবিংশ শতাব্দীর মানুষ সম্বন্ধে চিন্তা করা সম্ভব।
রোবটীয় বিজ্ঞান পড়েই আমি রোবট-বিরোধী হয়েছি।
আপনার রোবটজ্ঞান কিন্তু খুবই সীমিত। আপনি চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিয়ে ভেবেছিলেন এ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ নেই।
ওর চুপ করে থাকা দেখেই কি আপনি সন্দেহ করেন ?
সেটা কোনই শক্ত কাজ ছিল না।
অধ্যাপক হঠাৎ কথায় ছেদ টানতে চান,—এসব কথায় আর লাভ কী।
আমার দিক থেকে লাভ আছে। আপনাকে আমি বলতে এসেছি যে রোবট সম্বন্ধে কত কম আপনি জানেন। আপনি ইজিকে চুপ থাকতে বলেছিলেন এই বলে যে আপনার পরিবর্তনগুলো যদি ও প্রকাশ করে আপনার চাকরিতে ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে ওর মাথায় একটা বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষেত্র তৈরি হয়। যেটাকে ভেদ করে কোন কথা আমরা বের করতে পারিনি। জোর করলে ওর মাথার ক্ষতি হত। সেদিন কিন্তু আপনি নিজেই ওর মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী এক ক্ষেত্র তৈরি করেন। আপনি নিজেই বলেন যে সবাই যদি ভাবে আপনিই বইতে পরিবর্তন করেছেন তবে আপনার চাকরি যাবার থেকেও বৃহত্তর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আপনি আপনার সুনাম, যশ

তথা জীবন রাখার সার্থকতাও হারাবেন। সাথে সাথেই ইজি কথা বলে উঠেছে। হায় ভগবান! নিনহাইমারের বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

সুজান কেলভিন কিন্তু অবিচল,—বুঝলেন, ইজি কেন সেদিন কথা বলে উঠেছিল? আপনাকে দোষারোপ করার জন্য নয়, আপনাকে বাঁচাবার জন্য। প্রথম নিয়ম অনুসারেই ও নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে যাচ্ছিল। ও মিথ্যে কথা বলতে উদ্যত হয়েছিল যাতে ওর নিজের তথা একটা সংস্থার ক্ষতি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু একজন মানুষ বাঁচানোর প্রচেষ্টা ওর কাছে অনেক বেশি জরুরী। আপনি যদি রোবট বা রোবট বিজ্ঞান ঠিকমত বুঝতেন, তবে ওকে সেদিন কথা বলতে আটকাতেন না। আমি জানতাম আপনি ওকে বাধা দেবেনই। রোবটের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার ফলে আপনি ভেবেই নিয়েছিলেন ও একটা সাধারণ মানুষের মতন নিজেকে বাঁচাতে চাইবে। আপনি ওর ওপর চটে উঠে নিজেরই সর্বনাশ করলেন।

ধরা গলায় বলেন অধ্যাপক,—আশায় থাকব আপনার রোবট একদিন আপনারই গলা চেপে ধরবে।

বোকার মতন কথা বলবেন না। এখন বলুন তো এসব কেন করতে গেলেন?

আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না আনার বদলে আমার হৃদয় ঘুরে দেখতে চান, তাই কি?

আপনি যদি সেভাবে দেখতে চান, তবে তাই। কিন্তু কারণটা পরিষ্কার করে বলুন দয়া করে।

বেশ বলব। কিন্তু তাতে আপনার কোনই লাভ হবে না। মানুষের মনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি আপনার বোঝার ক্ষমতার বাইরে। আপনি কেবল যন্ত্রের মন বুঝতেই পারেন।

দ্রুত নিশ্বাস পড়তে থাকে অধ্যাপকের। কথা বলতে আর থমকে থমকে দাঁড়াতে হয় না শব্দ খোঁজবার জন্য। উনি বলে চলেন,—গত আড়াইশো তিরিশ বছর ধরেই মানুষের বদলে যন্ত্রের স্থান করে নিচ্ছিল মানব সমাজ। তার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাচ্ছিল হাতের কাজ। কুমোরের হাতের স্পর্শের বদলে ছাঁচে তৈরি হচ্ছে চিনা-মাটির জিনিস, খোদাই করা শিল্পের বদলে যন্ত্রের আদর বাজারে চলছে। শিল্প এখন কেলবমাত্র চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ, মনে মনে শুধু ভাবছে আর বাকিটা হচ্ছে যন্ত্রে। কিন্তু কুমোরই শুধু ভাবনায় রূপ সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট হতে পারে। হাতের সাথে মাথা সংযোগে যে রূপ সৃষ্টি হয় তার আজ আনন্দ কোথায়?

কিন্তু আপনি তো কুমোর নন?

কিন্তু আমি একজন শিল্পী। আমি লেখার মধ্যে আমার শিল্প সৃষ্টি করি। শুধু ভাবনাতে শব্দ সাজালেই বই হয় না। হাতে কলমে গড়ে ওঠে সার্থক একটা বই। প্রত্যেকটা শব্দ পংক্তি, পাতা বা পরিচ্ছদ ধীরে ধীরে কাটাকুটির মধ্যে গড়ে ওঠে। একশ বার হাজার বার স্পর্শ করতে হয় সৃষ্টিকে, তার প্রত্যেকটিই সুখদায়ক।

আপনার রোবট সেই সুখ থেকে সবাইকে বঞ্চিত করবে।
কিন্তু টাইপরাইটার বা মুদ্রণযন্ত্র, সেও তো একই। আপনি কি আবার হাতে লেখা পুঁথির যুগে ফিরে যেতে চান ?
টাইপরাইটার বা মুদ্রণযন্ত্র কিছুটা সুখ কেড়ে নেয় ঠিকই, কিন্তু আপনার রোবট নেয় পুরোটাই। ও অধিকার করে নেবে গ্যালিকে। নিকট ভবিষ্যতে অন্য কোন রোবট অধিকার করে নেবে পাণ্ডুলিপির দায়িত্ব অথবা বইপত্রের গবেষণার ভার। আরকি বাকি থাকল লেখকের জন্য ? একটি মাত্র কাজ, রোবটকে পরবর্তী নির্দেশ কি দেবে সেইটা নির্ধারণ করা। এটা অসহ্য। এর থেকে ভবিষ্যতের লেখক গবেষকদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম আমি। আমার নিজের সুনামের থেকেও এটা অনেক বেশি মূল্যবান, তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রোবট কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলাম আমি। যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে।
হার ছিল আপনার অবশ্যম্ভাবী।
চেষ্টা করা ছিল আমার অবশ্যকর্তব্য।
ডঃ কেলভিন উঠে দাঁড়ান যাবার জন্য। প্রাণপণ চেষ্টা করেন হতযশ এই লোকটার জন্য কোন বেদনা বোধ না করতে। পুরোপুরি সফল হতে পারেন না।

ভাষান্তর : সিদ্ধার্থ রায়

দি বেটার ম্যান

রে রাসেল

তাকে সত্যিই দেখবার মত—সুন্দরী, আভিজাত্যপূর্ণ। তবে এসব বিশেষণ তার না থাকলেও চলত। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যে সে একজন নারী। এও বলা হয় যে সে বোধহয় শেষতম নারী।
স্বভাবতই, সে হল মর্তের আশ্চর্য। তাকে পাবার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য। তার দুই প্রেমিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এরাও তাদের লিঙ্গের দুই শেষতম। ধ্বংসস্তূপের ইডেন উদ্যানে এদের মধ্যে বিজয়ী নতুন আদমের ভূমিকা পালন করবে।
নারী বললো, "তোমাদের অস্ত্র রেখে দাও। আর নয় মরণোৎসব। এস, যুক্তির সাহায্যে দেখা যাক কে যোগ্যতর।"
টেকো ও খুঁড়িয়ে-চলা মানুষটি এগিয়ে এল। "আমার নাম জন। আমিই যোগ্যতর। এটা সত্যি যে আমার ছেলেপুলে নেই, ঠিকমত দেখতে পাই না, একটা কানে শুনতে পাই না। আমার দাঁতগুলো বাঁধান। আজকাল ঘড়ঘড়ে সর্দিকাশিও হয়েছে। পারমাণবিক বিকিরণের ফলে আমার জিনেটিক কোডের কোনোরকম ক্ষতি হয়েছে কিনা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি শিক্ষিত, নানারকম কাজকর্মে দক্ষ। আমার অভিজ্ঞতার পরিধিও খুব ব্যাপক।
'ধন্যবাদ'। নারী বললো, 'এবার তোমার পালা।'
আরেকজন শুরু করলো, 'আমার নাম ৯ নম্বর'। এ বেশ লম্বা ও সুন্দর দেখতে। "আমি অবশ্য আদৌ মানুষ নই। আমার পুরো নাম হল নয় চার ছয় তিন সাত দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ দুই আট। আমি একজন অ্যানড্রয়েড। কিন্তু আমিই যোগ্যতর।"

জন মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললো "যোগ্যতর ! প্লাস্টিকের হাড়, রাসায়নিক রক্ত আর নকল মাংসের সমাহার। ছ্যাঃ !"
সুন্দরী বললো, "ন নম্বর, বুঝিয়ে বল কেন তুমি যোগ্যতর।"
ন নম্বর গলা খাঁকারী দিল, 'রোবট আর অ্যানড্রয়েডদের ইতিহাস বলে তোমার একঘেয়েমী আনতে চাই না।"
'দয়া করো', জন বললো।
"বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের যেভাবে পরিশীলিত করা হয়েছে, তা তোমরা খুব ভালভাবেই জান," ন নম্বর বললো।
জন কাঁধ ঝাঁকাল, "হ্যাঁ, চোখ টেলিভিশন ক্যামেরার লেন্স না হয়ে ঠিক চোখেরই মতন কাজ করছে।"
"চুল ও নখ মানুষের মত," নারী যোগ করলো।
"শরীরস্থ ময়লা নিঃসরণের প্রণালীও মানুষের মতো," জন চোখ মারলো, "মাপ করবেন ম্যাডাম।"
"হাসি, চোখের জল," সুন্দরী হাসলো।
ন নম্বরও নারীর দিকে চেয়ে হাসলো, "সবই ঠিক। খুবই দক্ষতার সঙ্গে আমাদের তৈরি করা হয়েছে, স্বভাবতই আমরা সঠিক মানুষ। আজ পর্যন্ত, পৃথিবীতে সবচেয়ে দক্ষ মেসিন হল মানুষের শরীর ও মগজ। তোমরা, আসল মানুষেরা ক্রমশ বেশি বেশি করে নকল দাঁত পরছো, আজ এই গণ্ডগোল, কাল ওই গণ্ডগোল, পার-মানবিক বিকিরণ জনিত রোগের শিকার হয়ে ক্রমশ অমানবীয় আচরণ করছো। আমরা অ্যানড্রয়েডরা কিন্তু অনেক বেশি মানবিক। জন, তুমি ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং অশক্ত হবে। আমার এই শরীর যন্ত্রটা কিন্ত কয়েকশো বছর টিঁকবে। আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরি, কান ও চোখ তোমার চেয়ে অনেক ভাল। নতুন পৃথিবী গড়তে এই জিনিসগুলোর খুব প্রয়োজন।" দুহাত তুলে সে বক্তব্য শেষ করলো, "সুতরাং বুঝতেই পারছো যে কোনোরকম প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই।"
খুব আত্মতৃপ্তিসহকারে জন বললো, "একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।"
"ভুলিনি।" ন নম্বর বললো, "সাধারণতঃ ল্যাবোরেটরিতেই আমাদের তৈরি করা হয় মানছি। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে আমরা আবার অ্যানড্রয়েড উৎপন্ন করতে পারি। সম্প্রতি অতি গোপনীয় গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে অন্ততঃ তত্বগতভাবে আমরা মানুষের সঙ্গে বিবাহযোগ্য।"
জন তড়বড় করে তোতলায়, বলল, "কিন্তু তা হবে ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার, জন্মেও কেউ শোনেনি এরকম। একটা নারী আর অ্যানড্রয়েড ? অসম্ভব !"
"কিন্তু এটাও সত্যি," ন নম্বর প্রত্যুত্তর দিল।
তাদের সুদুর্লভ পুরস্কার গভীর ভাবে তাকিয়েছিল সুপুরুষ ন নম্বরের দিকে।

অতঃপর চোখ ফেরাল জনের দিকে। বললো, "ওই যোগ্যতর……মানুষ জন।"
জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ মেরে গেল। আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তারা শুনলো একটা গুলির শব্দ, তারপর ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ।
"হায় জন," নারী বললো, "তোমার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।"
"আমিও," ন নম্বর বললো, "কিন্তু এই হল জীবন।" দুজনে বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলো। ন নম্বর কথা বলছিল, "জনের শিক্ষাদীক্ষা, কাজকর্ম ইত্যাদি শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পাল্লা ওর দিকেই ঝোঁকা ছিল……"
"প্রায় তাই"।
"সেই জন্যেই অ্যানড্রয়েডের ছদ্মবেশটা নিলাম। আমার নাম মোটেই ন নম্বর নয়। আমি বিল - শতকরা একশ ভাগই মানুষ।"
"আম্মো ঠিক তাই ঠাওরেছি," জন লাফিয়ে এসে দাঁড়াল, "শুধু মিথ্যুকই নয়, মাথায় আবার গোবর পোরা। আমার সামান্য শব্দকৌশলে বোকা বনে গেলে।"
জন ঘুরে দাঁড়ালো নারীর মুখোমুখি, "এইরকম নর্মসহচর আকাঙ্ক্ষা করেছিলে প্রিয়া? এরকম নীতিবর্জিত মানুষ? মানসিক পঙ্গু, নৈতিক ভাবে দেউলিয়া পেশী ফোলানো এক জন্তু? এই তাহলে যোগ্যতর?
নারী সামান্যক্ষণের জন্য বিচলিত হল, "না জন, নতুন জাতির জন্মদাতা হবে বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্ববান। তুমিই যোগ্যতর।"
জন বিলকে বললো, "আগামী পৃথিবীর জাতকদের বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি। এখানে কোন বিচারক বা জুরী নেই, তাই তাদের অবর্তমানে আমিই তোমাকে শাস্তি দেওয়ার ভার নিচ্ছি। তোমার শাস্তি মৃত্যু।"
বিলের মাথায় গুলি করলো জন।
জন বললো, "চলো প্রিয়া। নষ্ট করার মত আর সময় নেই। মানছি, আমি বিলের মতো যুবক কি সুন্দর নই, কিন্তু দেখ, আমিও বেটাছেলে।"
"তুমি কি অ্যানড্রয়েড?" নারী শুধোল।
জন বললো, "মানুষ আর অ্যানড্রয়েডের তুলনামূলক বিচারটা অবশ্য বিল ঠিকই করেছিল। তবে কিনা, আমি তোমায় হারাতে চাই নি। সেইজন্যে অ্যানড্রয়েডদের সম্বন্ধে ঐ সব কথা বলেছিলাম। কিন্তু কিই বা তফাত হত যদি অ্যানড্রয়েড হতাম। যাই হোক, আমি অবশ্য সবদিক দিয়েই মানুষের মত।
নারী স্মিত হাসল, হাত ধরে বললো "তুমি কি সুন্দর!"

ভাষান্তর ঃ সোমনাথ সান্যাল

দি পারফেক্ট উওম্যান

রবার্ট শিক্‌লে

মুখে বিস্বাদ নিয়ে ঘুম ভাঙ্গে মিস্টার মোরচেকের। কানে তখনও বাজছে একটা হাসির শব্দ। গত রাতের ট্রায়াড মরগানের পার্টির শেষ অবধি যা মনে আছে তা হল জর্জ ওয়েন ক্লার্কের ঐ হাসি। কী পার্টিই না ওটা ছিল। সারা পৃথিবী শতাব্দীর শেষ দিন পালন করছিল। তিন হাজার সাল! প্রত্যেকের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি, এবং সুখী জীবন…

"সুখে আছো ?" অর্থপূর্ণ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল ওয়েন ক্লার্ক, নেশাটা বেশ চড়েছে তখন। "মানে, তোমার মিষ্টি বউটিকে নিয়ে কেমন কাটছে দিন তোমার ?"

প্রশ্নটা মোটেই সুখকর ছিল না। সবাই জানে যে ওয়েন ক্লার্ক একজন প্রাচীনপন্থী, কিন্তু তা নিয়ে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার ওকে কে দিয়েছে ? ও একজন আদিম নারীকে বিয়ে করেছে বলেই…

"আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি।" বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দেয় মোরচেক। "এবং তোমরা যাদেরকে তোমাদের স্ত্রী বল সেইসব স্নায়ুরোগগ্রস্তদের চেয়েও অনেক ভাল এবং চট্‌পটে।"

কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের মোটা চামড়া ভেদ করাটা খুব সোজা কাজ নয়। প্রাচীনপন্থীরা তাদের স্ত্রীদের গুণগুলোর মত দোষগুলোকে সমান ভালবাসে, হয়ত বেশিই। ওয়েন ক্লার্ক আরো গূঢ় হাসি হেসে বলে "কিন্তু ব্যাপারটা কি জান মোরচেক, আমার মনে হয় তোমার স্ত্রীকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়েছে। ওর চালবলা লক্ষ্য করে দেখেছ ইদানিং ?"

আহাম্মক কোথাকার! মোরচেক পর্দার বাইরের সকালের রোদ দেখতে দেখতে উঠে

পড়ে বিছানা থেকে। মীরার চলা বলা,—ওয়েনের কথায় একবিন্দু সত্যি কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। আজকাল মীরার কি যেন একটা ব্যতিক্রম কোথাও ঘটেছে।
"মীরা", মোরচেক হাঁক পাড়ে, "আমার কফি তৈরি হয়েছে?" অল্প একটু নিস্তব্ধতার পর ওর গলা পরিষ্কার ভেসে আসে নিচের থেকে, "আর এক মিনিট।"
মোরচেক তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পালটে নেয়, ঘুম তখনও পুরো যায়নি চোখ থেকে। অবশ্য আগামী তিনটে দিনই উৎসবের ছুটি। গতকালের পার্টির ধকল কাটাতেই পুরো তিনদিনের দরকার হবে।
নিচের তলায় মীরা কাজ করছিল—কফি তৈরি করা, ন্যাপকিন ভাঁজ করা ইত্যাদি। চেয়ার টেনে দিতে বসল মোরচেক। মীরামোরচেকের টাকপড়া কপালে চুমু খায়। টাকে চুমু খেলে ভালই লাগে মোরচেকের।
"কি খবর, কেমন আছ?" ও জিজ্ঞেস করে।
"খুব ভাল ডার্লিং", একটু থেমে উত্তর দেয় মীরা। "তোমার জন্য বড়া বানিয়েছি আজ, তুমি পছন্দ কর।"
মোড়চেক একটাতে কামড় বসিয়ে কফিতে চুমুক দেয়। "আজ সকালে কেমন বোধ করছ?" মোরচেক জিজ্ঞাসা করে।
মীরা ওর জন্য একটা টোস্টে মাখন মাখিয়ে বলে, "খুব ভাল। কাল রাতের পার্টি খুব আনন্দদায়ক, নিখুঁত হয়েছিল। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি।"
"আমি অবশ্য একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম," হেসে বলে মোরচেক।
"নেশাগ্রস্ত হলে তোমাকে আরো ভালো লাগে আমার" মীরা বলে চলে, "দেবদূতের মতন কথা বলতে থাক তখন, অবশ্য চালাক একজন দেবদূতের মতন। সারা দিন তোমার কথা শুনতে পারি আমি।" আরেকটা টোস্টে মাখন লাগায় মীরা।
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মোরচেকের চোখ মুখ, তারপরেই ভুরু কোঁচকায়। খাবার নামিয়ে রেখে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "জান, কাল ওয়েন ক্লার্কের সাথে বসে একটু বচসাই হয়ে গেল। ও প্রাচীনা মহিলাদের পক্ষ নিয়ে তর্ক করছিল।"
মীরা কোন জবার দেয় না। পঞ্চম টোস্টটিতে মাখন মাখিয়ে ক্রমবর্ধমান টোস্টের গাদায় রাখে। ষষ্ঠ টোস্টের দিকে হাত বাড়ালে মোরচেক আস্তে ওর হাত ছুঁয়ে ওকে থামায়।
"প্রাচীনা মহিলা!" অবজ্ঞাভরে বলে মীরা, "ঐ স্নায়ুরোগগ্রস্ত প্রাণীগুলো! তুমি আমাকে নিয়ে কি আরো সুখী নও? আমি আধুনিকা হতে পারি, কিন্তু কোন প্রাচীনাই আমার মত তোমায় একনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসতে পারত না—এবং আমি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নজর দেই।"

কথাটা সত্যি। মানুষ তার জ্ঞাত ইতিহাসে গর্ভজাত নারীদের নিয়ে এত সুখে কখনো ঘর করেনি। ঐ উন্নাসিক, বয়ে যাওয়া প্রাণীগুলো সমস্ত জীবন ধরে যত্ন

এবং মনযোগ দাবি করে এসেছে। এটা খুবই অন্যায় যে ওয়েন ক্লার্কের স্ত্রী তার স্বামীকে দিয়ে থালা অবধি ধোয়ায়, অথচ বোকাটা সহ্যও করে! ওরা সর্বদা টাকা পয়সা চাইবে শাড়ী এবং গয়না কিনবার জন্য, বিছানায় বসে সকালের জলখাবার খাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিশফোনে গল্পগুজব করবে, অথবা কোথাও গিয়ে তাসের আড্ডা জমাবে। আরো কি করে না করে তা ভগবান জানেন। ওরা পুরুষদের কাজকর্ম ছিনিয়ে নিতেও চেয়েছিল একসময়। ওরাও পুরুষদের সমান, এটা প্রমাণ করে তবেই অবশ্য ওরা থেমেছে।

কেবল ওয়েল ক্লার্কের মত কয়েকটা আহাম্মক ওদের উৎকর্ষ প্রমাণ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্ত্রীর সহৃদয় কথায় মোরচেকের ঘুম ঘুম ভাবটা অবশেষে চলে যেতে থাকে। মীরা অবশ্য খাওয়াতে যোগ দেয়নি। মোরচেক জানে যে ও আগেই খেয়েছিল, যাতে মোরচেকের খাওয়ার দিকে পুরো নজর দিতে পারে। এই জাতীয় ছোটখাট ব্যাপারই দুদলের তফাতটা প্রমাণ করতে যথেষ্ট।

"ওয়েনক্লার্ক বলছিল যে তোমার দক্ষতা নাকি কমছে, প্রতিক্রিয়া করতে সময় বেশি লাগছে তোমার?"

"বলেছে নাকি?" একটু নীরবতার পরে বলে মীরা। "প্রাচীনপন্থীগুলো নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবে।"

উত্তরটা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু তা দিতে বড় বেশি সময় নিল মীরা। মোরচেক পরপর আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে স্ত্রীকে, এবং বুঝতে পারে মীরা ক্রমেই শ্লথ হয়ে যাচ্ছে।

"কোন চিঠি পত্র এসেছে? কেউ খোঁজ করেছিল কি? আমার কি দেরী হয়ে গেল?"

তিন সেকেন্ড পরে মীরা মুখ খুলে আবার বন্ধ করে নেয়। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে ওর।

"আমি তোমায় ভালবাসি," কেবল এটুকু বলতে পারে মীরা।



বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত আন্দোলন টের পায় মোরচেক। ও সত্যিই মীরাকে ভালবাসে, গভীরভাবে, পাগলের মতন। বিরক্ত উদ্রেককারী ওয়েনক্লার্ক কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল। ওকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

মীরা বোধহয় মোরচেকের মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলো। কথা বলার জন্য কষ্ট

হয় ওকে, "আমি কেবল তোমার সুখ চাই। আমার মনে হচ্ছে আমার কোন অসুখ করেছে.. তুমি আমায় সারিয়ে তুলবে তো? তুমি আবার আমায় ফিরিয়ে নেবে কি— আমাকে বদলে নেবে না তো—আমার বদলাতে একটু ইচ্ছে করছে না।" হাতে মাথা রেখে ও কাঁদতে আরম্ভ করে, নিঃশব্দে, যাতে মোরচেকের বিরক্তি না ঘটে।
"একটু পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া শুধু" নিজের কান্না চাপতে চাপতে বলে মোরচেক। কিন্তু ও বুঝতে পারে যে মীরা সত্যিই নিদারুণ ভাবে অসুস্থ।
মোরচেকের মনে হচ্ছিল এটা অত্যন্ত অন্যায়। প্রাচীনা নারীদের মস্তিষ্ক অসূক্ষ্ম স্নায়ু দিয়ে তৈরী হলেও, ওদের এজাতীয় অসুখ হয় না। কিন্তু আধুনিকাদের মস্তিষ্ক এত ভারসাম্যপূর্ণ হলেও, এ রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এটা অত্যন্ত অন্যায়, অবিচার। কারণ এই আধুনিকারাই নারীজাতির আদর্শ, সর্ব্বগুণসম্পন্না— কেবল মাত্র সুস্থ থাকার ক্ষমতা ছাড়া।
কষ্ট করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মীরা। ও সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। গাল দুটো ওর লাল দেখাচ্ছিল একটু, সকালের রোদে মাথার চুলগুলো আরো উজ্জ্বল।
"আমাকে কি আর একটু থাকতে দেবে না? ও বলে, "হয়ত নিজের থেকেই আমি ভাল হয়ে উঠব। কিন্তু ওর দৃষ্টি দ্রুত ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে।
"প্রিয়তম... " ও টেবিলের কোণা ধরে নিজেকে সামলায়, "যখন তোমার নতুন স্ত্রী আসবে – মনে রেখ তোমায় কত ভালবাসতাম।" ভাবলেশহীন মুখে ও বসে পড়ে।
"আমি গাড়ি ডাকছি", বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে মোরচেক। আর এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারছিল না। গ্যারেজের দিকে যেতে যেতে নিজেকে ক্লান্ত, হৃতসর্বস্ব বোধ করে। মীরা— চলে গেল। এবং আধুনিক বিজ্ঞান তার সকল মহান কীর্তি নিয়েও কোন সাহায্যই করতে পারল না।
গ্যারেজের কাছে এসে মোরচেক বলল, "ঠিক আছে, বেরিয়ে এস।" নিঃশব্দে গাড়িটা ওর পাশে এসে দাঁড়ায়।
"কিন্তু গোলমাল হয়েছে?" গাড়িটা প্রশ্ন করে, "আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। কালকের পার্টিতে কিছু হয়েছে?"
"না—মীরার জন্য, ও খুব অসুস্থ।"
গাড়িটা খানিক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার মোরচেক। আমি এসময়ে কি কোন উপকারে আসতে পারি?"
"ধন্যবাদ। এ সময়ে একজন বন্ধুকে পেয়ে ভাল লাগছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বোধহয় কারোরই কিছু করার উপায় নেই।"
গাড়িটা বাড়ির দরজায় এসে লাগে। মোরচেক মীরাকে ধরে নিয়ে এসে গাড়িতে তোলে। গাড়ি নিঃশব্দে চলতে শুরু করে।
গাড়িটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ নীরবতা পালন করে, কারখানা অবধি সারা পথ।

ভাষান্তর : দীপালি রায়

আই সিঙ্গ দি বডি ইলেকট্রিক

রে ব্র্যাডবেরী

ঠাকুমা যেদিন জন্মালো—
সেদিনটা আমার এখনও মনে পড়ে ছবির মত। জানি জানি, আপনারা কি বলতে চাইছেন। কোন লোকই তার ঠাকুমাকে জন্মাতে দেখতে পারে না।
কিন্তু আমরা সত্যিই দেখেছি। শুধু দেখিনি, আমরা মানে তাঁর নাতি-নাতনীরাই টিমোথি, আগাথা, আর আমি টম তাকে এই পৃথিবীতে এনেছি।
আমরাই অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলোকে একটা একটা করে সাজিয়ে তার অবয়ব তৈরি করেছি। তার চোখে দিয়েছি দৃষ্টি আমাদের দেখার জন্য। মুখে ফুটিয়েছি ভাষা, রাত্রে আমাদের গান গেয়ে ঘুম পাড়াবার জন্য।
আমাদের প্রিয় ঠাকুমা, অত্যাশ্চর্য এক বৈদ্যুতিক স্বপ্ন!
যখন ঘন মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকায়, আমার মনের গভীরেও তখন চমকে ওঠে ঠাকুমার নাম। নিঝুম রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে এখনও কানে ভেসে আসে ঠাকুমার মৃদু শান্ত সুরেলা গুনগুনানি। আমার স্মৃতির মণিকোঠায় ঠাকুমার ছবি প্রেতাত্মার মত ঘুরে ফিরে বেড়ায়, হারিয়ে যাওয়া গ্রীষ্মের মধুর স্মৃতির মত।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনারা বলবেন, কিন্তু সেটা কোন দিন, যেদিন তোমার সেই অত্যাশ্চর্য, ভয়ানক আদরের ঠাকুমা জন্মালেন?
আমাদের পৃথিবীটা যেদিন স্তব্ধ হয়ে গেল, সেই সপ্তাহেরই কোন এক দিন সেটা।
আমাদের 'মা' মারা গেলেন।
এক বিষণ্ণ দুপুরে একটা কালো গাড়ি বাবা এবং তিন ভাইবোনকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ফ্যালফেলিয়ে লনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই নিষ্প্রাণ লন, এটা আমাদের? সেই সব ব্যাট-বল খেলনাগুলো সেদিন থেকে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, যেদিন বাবা হোঁচট খেতে খেতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে লনের ওপর দিয়ে আসছিল। সেই রোলার স্কেটটা যেটা একটা ছেলের, আমার, যে আর কোনও দিন রোলার স্কেট নিয়ে খেলার বয়সে ফিরে যাবে না। আর গাছের ডালে বাঁধা সেই টায়ারের ঘূর্ণি দোলনাটা? আগাথা আর ওটায় দুলতে সাহস পাবে না। দড়িটা নিশ্চয় ছিঁড়ে যাবে, দোলনাটা পড়ে যাবে।

আর আমাদের বাড়িটা? ওঃ ভগবান!

আমরা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম। ভয় হচ্ছিল আমাদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি বুঝি ফাঁকা হলে দিশাহারা হয়ে পড়বে।

দরজাটা হাট করে খুলে গেল।

খাঁ খাঁ নিস্তব্ধতা এসে যেন গলা টিপে ধরতে চাইছে। কোথাও একটা চোর-কুঠুরির খোলা দরজা দিয়ে ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা হাওয়া ভেসে আসছে।

কিন্তু আমার মনে হোতে লাগল আমাদের কোনও চোর-কুঠুরিই নেই।

"তাহলে"—বাবাই প্রথম কথা শুরু করল। আমরা কেউ পড়লাম না।

হঠাৎ দেখি ক্লারা কাকিমার বিরাট লিমুজিন গাড়িটা এদিকেই আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে আমরা যেন প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে উঠলাম, তারপর ছুট ছুট পাগলের মত দৌড়ে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ঘরে বসে ওদের চিৎকার কানে আসছিল। ওরা কথা বলছে তারপর চিৎকার করছে, আবার কথা বলছে, আবার চেঁচামেচি করছে।

"বাচ্চাগুলোকে আমায় মানুষ করতে দাও।" চেঁচিয়ে উঠল ক্লারা কাকিমা।

"তার চেয়ে ওরা বরং নিজেদের শেষ করে ফেলবে।" বাবা বলল।

দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, ক্লারা কাকিমা চলে গেলেন।

আনন্দে আমরা নেচে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তখনি আবার সব মনে পড়ে গেল। সেই নিস্তব্ধতা ফিরে এসে গ্রাস করল আমাদের। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেলাম।

বাবা একা বসে নিজের মনে কথা বলছিল, কিংবা হয়ত মার অসুখের আগের দিনগুলোর স্মৃতির উজ্জ্বল প্রতিমূর্তির সঙ্গে। নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে বাবা বিড়বিড় করছিল।

"বাচ্চাগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য কাউকে খুব দরকার। আমি, আমি ওদের ভালবাসি, কিন্তু অফিস কাজকর্ম সব বন্ধ করে সারাদিন ওদের সঙ্গে বসে থাকব? তুমি ওদের ভালবাসতে অ্যান, কিন্তু তুমি চলে গেলে। আর ক্লারা? ওঃ অসম্ভব, ওর ভালবাসার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিংবা যদি একটা নার্স কিংবা দাই রাখা যায়"—

বাবা কথা থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আমরাও। মার অসুখের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। কত আয়া, শিক্ষিকা আর সিস্টারই ত আমাদের দেখাশোনার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁর হাতে পড়ে আমাদের দশা ধারালো ঘাস ছাঁটা কাঁচির মুড়ে পড়া ঘাসের মত হয় নি। একমাত্র হ্যারিকেনের মতন প্রবল ঝটিকার সঙ্গেই তাদের তুলনা চলে। আমরা, ছোটরা তাদের কাছে যেন কতগুলো প্রাণহীন, বোধশক্তিহীন আসবাব। আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করা যায়, যেখানে খুশি ফেলে রাখা যায়।

"আমাদের এখন যা দরকার," বাবা বলল "–তা হোল……"

আমরা তিনজনে বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

"—একজন ঠাকুমা।"

"কিন্তু," টিমোথি তার নয় বছরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় বলে উঠল "আমাদের সব ঠাকুমা দিদিমারাই ত মারা গেছেন বাবা?"

"হ্যাঁ তোমার কথাটা এক অর্থে ঠিক, আবার আরেক অর্থে নয়।"

কি অদ্ভুত কথাবার্তা বলছে বাবা?

"এই নাও এটা দেখ।" অবশেষে রহস্যের জট ছাড়িয়ে বাবা বলে উঠল। তারপর বেশ কয়েকটা ভাঁজ করা একটা রং-চঙে চটি বই আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। বইটা গত বেশ কিছুদিন যাবৎ বাবাকে নাড়াচাড়া করতে দেখেছি। এখন একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম বইটা কি। বুঝতে পারলাম কেন ক্লারা কাকিমাকে বাবা এক কথায় নাকচ করে দিয়েছে।

টিমোথিই প্রথমে বইটা নিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল।

"বৈদ্যুতিক শরীরে আমি নাই।"

"কি অদ্ভুত কথা, মানে কি এটার?"

বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ও।

"পড়ে যাও।" বাবা বলল।

আমি আর আগাথা অপরাধী দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। ভয় হচ্ছিল যেন মা পেছন থেকে এসে আমাদের এই ভীষণ অন্যায় আলোচনা শুনে ফেলবে। কিন্তু তারপর আবার মাথা নেড়ে টিমোথিকে পড়া চালিয়ে যেতে বললাম। ও পড়তে লাগল ঃ

"ফ্যা-ন-টো—"

"ফ্যাণ্টোস্সিনি" বাবা বলে দিল।

"ফ্যাণ্টোস্সিনি লিমিটেড।" টিমোথি পড়ে চলল…

"আপনারা যারা তাদের বাচ্চাদের অমনোযোগী নার্স কিংবা দাইদের (যাদের হাতে সর্বদাই থাকে পানীয়ের বোতল।) হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছেন না। অথবা সেই সব শুভাকাঙ্ক্ষী কাকা, কাকিমা আত্মীয়স্বজন—"

"শুভাকাঙ্ক্ষী হুঃ", আমার গলায় এসে যাওয়া কথাটার প্রতিধ্বনি করে আগাথা বলে উঠল।

"— তাদের মনের অবস্থার কথা স্মরণে রেখেই আমরা প্রথম মানবাকৃতি মিনিসার্কিটেড রিচার্জেবল এসি, ডিসি মার্ক ফাইভ বৈদ্যুতিক ঠাকুমা তৈরি করেছি...

"ঠাকুমা !?"

কাগজটা টিমোথির হাত থেকে মসে পড়ল মাটিতে।

"বাবা.........?"

"আঃ আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থেকো না।"

বাবা বলল "আমি অর্ধেক পাগল শোকে দুঃখে, অর্ধেক ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায়। কাল কী হবে, তারপর পরশু কে তোমাদের দেখাশুনা করবে? কেউ একজন বইটা কুড়িয়ে নিয়ে শেষ করো।"

"আমিই পড়ছি" বলে কাগজটা তুলে নিলাম।

"এই খেলনাটা, সেটা একটা সাধারণ খেলনার থেকে বেশি অনেক কিছু। ফান্টোম্সিনি বৈদ্যুতিক ঠাকুমাকে এমন নিখুঁত ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে সে আপনার সন্তানদের গভীর ভালবাসা দিয়ে মানুষ করতে পারে। আদরে যত্নে ভরিয়ে তুলতে পারে তাদের ছোট্ট মন। শুধু তাই নয়, শিশুদের কল্পনার জগতে যে আরাম, আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষ লুকানো থাকে, তাকেও বাস্তব রূপ দেওয়া তার লক্ষ।"

"এই ঠাকুমাকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সে পর্যায়ক্রমে ১২টা ভাষায় শিক্ষা দিতে পারে। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস প্রভৃতি সব বিষয়েই তার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে।"

"কি দারুণ!" টিমোথি বলে উঠল "ঠিক যেন মৌমাছি পালার মত ব্যাপার। এক ঝাঁক শিক্ষিত মৌমাছি।"

"ওঃ চুপ করো।" আগাথা খিঁচিয়ে উঠল।

"— সবচেয়ে বড় কথা" আমি পড়ে চললাম "এই বৈদ্যুতিক ঠাকুমা একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, কারণ তাকে দেখতে মানুষের মতন। মানুষের এক হুবহু অনুকরণ সে। যে মানুষের মতন শুনবে, জানবে, কথা বলবে, আচরণ করবে, আপনার শিশুদের ভালবাসবে, যত্ন করবে। তার সাহচর্য পৃথিবীর যে কোনও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সঙ্গেই তুলনীয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাজারো রহস্যের গল্প শুনিয়ে সে ভরিয়ে তুলবে আপনার সন্তানদের অসহায় নিঃসঙ্গতাকে।"

"আমাদের অসহায় নিঃখঙ্গতাকে।" বিড়বিড় করে বলল আগাথা।

বিষন্ন মনে আমরা ভাবতে লাগলাম, "সত্যিই এতো আমাদের কথা, আমাদেরই—"

লেখাটা পড়া শেষ করলাম ঃ

আমরা এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি বৈদ্যুতিক ঠাকুমাকে এমন কোনও পরিবারে বিক্রি করব

না যেখানে বাবা, মা দুজনেই বর্তমান। যাঁরা নিজেরাই তাঁদের সন্তানদের ভালবাসতে মানুষ করতে সক্ষম। বাবা মার এমন পরিবারও আছে যেখানে কোনও মৃত্যু, কিংবা অসুস্থতা বা অন্য কোনও বিশেষ কারণ, সন্তানদের মানুষ করার, তাদের ভালভাবে বেড়ে ওঠার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। অনাথ আশ্রম, কিংবা হোস্টেল এই সমস্যার জবাব নয়। নার্স কিংবা দাইরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের কাজে মনোযোগী হবে না, অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে শিশুদের, তাদের পরিবারের লোকেদের মানসিক অবস্থা প্রয়োজন ইত্যাদির কথা গভীরভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা একজন আদর্শ শিক্ষিকা, বন্ধু, সঙ্গী, রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় ইত্যাদির সমগোত্রীয় একটা কিছু বানাতে সমর্থ হয়েছি। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা চাইলে কিছুদিনের জন্য একে পরীক্ষাধীনে রাখতে পারেন এবং……

"ব্যস ব্যস।" বাবা আমাকে থামিয়ে দিল।

"কেন?" টিমোথি জিজ্ঞেস করল।

"আমার তো বেশ ভালই লাগছে শুনতে।"

আমি চটি বইটা বন্ধ করে দিলাম "আচ্ছা ওদের কি সত্যিই এরকম কিছু আছে?"

"নাঃ থাক, এ ব্যাপারে আর কোনও আলোচনার দরকার নেই।" দুহাতে চোখ ঢেকে বাবা বলল "এসবই পাগলের প্রলাপ—"

"মোটেই ততটা পাগলামি নয়।" সমর্থনের আশায় টিমের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম। "মানে আমি বলতে চাই, ওরা যাই বানিয়ে থাকুক, শত চেষ্টা করলেও ক্লারা কাকিমার থেকে খারাপ কিছু নিশ্চয় তৈরি করতে পারবে না, তাই না?"

ওরা সবাই একসঙ্গে বাঁধভাঙ্গা হাসিতে ফেটে পড়ল। গত কয়েক মাস আমরা কেউ প্রাণখুলে হাসিনি। ওদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম।

আমাদের হাসির বেগ একটু কমতে আমি চটি বইটার দিকে তাকালাম। "তাহলে কি ঠিক করলে……?"

"আমি…" আগাথা জড়িত গলায় বলল।

"আমাদের কোনও একজনকে প্রয়োজন, এক্ষুনি।" টিমোথি বলল।

"আমি যে-কোন কিছুতেই রাজী।" আমি আমার সেরা মর্যাদাপূর্ণ কায়দায় বললাম।

"আমার একটা কথা বলার আছে।" আগাথা বলল। "আমরা এটার একটা পরীক্ষা করতে পারি ঠিকই।"

"কিন্তু বলতে পার—এইসব ইয়ার্কি কবে আমরা বন্ধ করব, কবে আমাদের মা বাড়ি এসে আমাদের সঙ্গে থাকবে?"

গোটা পরিবারটা থেকে একই সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নেওয়ার আওয়াজ উঠল। ওর কথাটা—আমাদের সকলের মনে একই সঙ্গে একই জায়গায় ঘা দিয়েছে।

আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কেউ সেই রাত্রে একটু সময়ের জন্যও কান্না

থামিয়েছিল।

সেটা ছিল একটা রোদ ঝলমলে দিন। স্কাইক্র্যাপারের মাথায় নামিয়ে দিল। ওপর থেকে নামটা আমরা পড়তে পারছিলাম।

ফ্যাণ্টোম্সিনি লিমিটেড। চতুর্থ ছায়া।

"ফ্যাণ্টোম্সিনি মানে কি?" আগাথা প্রশ্ন করল।

"এটা ছায়া পুতুল বা স্যাডো।" পাপেটের ইতালিও নাম স্বপ্নের মানুষও বলা যেতে পারে।" বাবা উত্তর দিল।

"আর চতুর্থ ছায়া মানে?"

"আমরা তোমার স্বপ্নটাকে আঁচ করার চেষ্টা করি।" আমি উত্তর দিলাম।

"বাঃ।" বাবা বলল "একশোয় একশ।"

আমি মাথা নাড়লাম।

হেলিকপ্টারটা আমাদের ওপর একটা কালো ছায়া ফেলে উড়ে গেল।

আমরা একটা লিফ্‌টে করে নিচে নামতে লাগলাম। যদিও আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডটা গলা দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। লিফট থেকে বেরিয়ে আমরা একটা চলমান কার্পেটের ওপর দাঁড়ালাম, সেটা স্রোতের মত বয়ে একটা ডেস্কের কাছে নিয়ে গেল। ওটার ওপরে একটা বিজ্ঞাপন ঝুলছিল।

ফাণ্টোম্সিনি আমাদের বিশেষত্ব। আমরা সবরকম সমস্যার সমাধান করি।

আমরা ডেস্কের কাছে পেঁছে গেলাম। মৃদু বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। দেওয়ালের পেছনে কোথাও একটা অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, যেন যন্ত্রপাতির একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে।

আমাদের চারিদিকে সিলিং থেকে দড়িদড়া, সুতোয় বাঁধা নানা রকম পুতুল, মুখোস, বালিদ্বীপের বাঁশের পুতুল, নাচের পুতুল এইসব ঝুলছিল। সেগুলোকে যদি চাঁদের আলোয় ধরা যায় তাহলে সেগুলো সবচেয়ে গোপনীয় স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্নের মধ্যে হানা দেবে। হাওয়া এসে ওপর থেকে ঝুলে থাকা নিষ্প্রাণ ঝুলন্ত দেহগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এ যেন সেই চারশ বছর আগে ইংলণ্ডে যে পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হোত সেই ধরনের কিছু।

আগাথা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছিল, ক্রমে সেটাও বিরক্তিতে পরিণত হলো।

"এই যদি ওদের বৈদ্যুতিক ঠাকুমা হয়, তাহলে চল এখান থেকে কেটে পড়ি।"

"দাঁড়াও।" বাবা বলল।

"কিন্তু–" আগাথা আপত্তি করে উঠল "ঐ দড়িতে নাচা বাজে পুতুল আমাকে গত বছর কিনে দিয়েছিলে। ওর দড়িটায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কোটি কোটি গেরো পড়ে গেল। শেষে ওটা আমি জানালা দিয়ে সোজা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।"

"একটু ধৈর্য ধর" বাবা বলল।
"আমরা দেখব দড়ির বদলে কি ব্যবস্থা করা যায় ওগুলোকে নাচানোর।"
ডেস্কের পেছন থেকে একজন কথা বলে উঠল। আমরা সবাই তার দিকে ফিরলাম। তাকে দেখতে অনেকটা কবরখানার কর্মচারীর মত। মুখে হাসি নেই। যে সব লোকেরা খুব বেশি হাসে তাদের বাচ্চারা খুব সন্দেহের চোখে দেখে। ঐ ধরনের লোকেরা তাদের বেশি বোকা বানানোর চেষ্টা করে।
না হাসলেও লোকটা খুব হাড়িমুখো, কিংবা পণ্ডিত মার্কা গম্ভীর নয়। "গুইডো ফ্যাণ্টোশ্নিনি, আপনাদের কাজে লাগার অপেক্ষায়। কিভাবে আমরা কাজ করি তার একটু নিদর্শন আপনাকে দিচ্ছি মিস আগাথা সাইমনস, বয়স এগারো।"
কি চালুরে বাবা লোকটা। ও জানে আগাথার দশ বছর বয়স। এক বছর ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলল, আগাথার ডাঁট বাড়িয়ে দেবার জন্য।
"এই নাও" লোকটা বলল। তারপর আগাথার হাতে একটা সুন্দর সোনালী চাবি দিল।
"কি এটা, দড়ির বদলে এটা দিয়ে ঠাকুমাদের চালানোর জন্য?"
"এটা দিয়ে চালানোর জন্য।" লোকটা মাথা নাড়ল।
"ধ্যাৎ" বলল আগাথা।
"ভগবানের দিব্যি, এটাই 'নিজে করো' সবচেয়ে ভালটা বেছে নাও বৈদ্যুতিক ঠাকুমার চাবি। রোজ সকালে তুমি তাকে চাবি ঘুরিয়ে চালিয়ে দিও, আর রাত্রে বন্ধ করে দিও। তুমিই এখন থেকে চাবিটার মালিক, তুমিই অভিভাবক।"
লোকটা আগাথার হাতে ধরা চাবিটার ওপর চাপ দিল। আগাথা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে ছিল।
আমি লোকটার দিকে তাকালাম। সে অমনি চোখ টিপে একটা ইসারা করল যার অর্থ মানে...চাবির ব্যাপারটা সত্যি নয় কিন্তু চাবি থাকাটাই একটা মজার ব্যাপার তাই না?
আগাথা মাথা তোলার আগে আমিও ওর দিকে চোখ টিপে ইসারাটা ফিরিয়ে দিলাম।
"চাবিটা কোথায় লাগবে?" আগাথা জানতে চাইলো।
"সেটা তুমি যথা সময়ে জানতে পারবে। তার পেটের মাঝখানে হতে পারে কিংবা বাঁদিকের নাকে আবার ডান দিকের কানেও হতে পারে।"
লোকটা উঠে দাঁড়াল "এই দিকে আসুন অনুগ্রহ করে। এই কার্পেটটার ওপর উঠুন, হ্যাঁ এইতো।"
আমরা আগের থেমে যাওয়া কার্পেটটা থেকে লোকটার সঙ্গে আরেকটায় গিয়ে উঠলাম। নদীর মতো সেটা বয়ে চলল দুপাশে। ছড়ানো সবুজ গালিচার মাঝখান দিয়ে। হলের ভিতর দিয়ে আলো-আঁধারি বড় বড় আশ্চর্য সব গুহার ভেতরে যেখানে আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। আমাদের মনে

গমগড়ে ওঠা হাজারো প্রশ্নের উত্তর যেন দৈববাণীর মত ঝরে পড়ছে।
"শুনুন" লোকটা বলল "সব ধরনের মহিলার গলার স্বর এখানে শুনতে পাবেন। তার মধ্যে যেটা আপনার পছন্দ বেছে নিন।"
আমরা শুনতে লাগলাম, মিষ্টি, কর্কশ, ভারী, মধুর, কৃত্রিম মধুমাখা, আন্তরিকতা মাখা, আত্মম্ভরী কত রকমের গলার স্বরই না এখানে জমানো আছে। কতকাল হয়ত আমাদের জন্মেরও আগে থেকে।
"তোমরা কথা বল" লোকটা বলল "চেঁচাও"। আমরা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।
"এই যে, তোমরা যারা এখানে আছ, শোন আমি টিমোথি।"
আমি কি বলি ? আমি চেঁচিয়ে বললাম "বাঁচাও।"
আগাথা পা ঘষটে ঘষটে পিছু হটে গেল, মুখ চেপে বন্ধ করে।
বাবা খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরল, আগাথা চেঁচিয়ে উঠল "না, না, আমাকে যেতে দাও ! আমি আমার আওয়াজ কিছুতেই কাজে লাগাতে দেব না, দেব না।"
"বাঃ অপূর্ব" লোকটা তার হাতে ধরা একটা ছোট্ট মেশিনের তিনটে ডায়াল ঘুরিয়ে দিল।
ছোট্ট মেশিনটার একদিকে তিনটে দোদুল্যমান রেখা একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। আমাদের চেঁচামেচির আওয়াজ ঘুরে ফিরে শোনা যেতে লাগল ?
একটু পরে লোকটা আরেকটা ডায়াল ছুঁল ; আমাদের গলার আওয়াজগুলো অমনি সেই বিরাট গুহাগুলোর ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুমড়ে মুচড়ে উড়ে চলে গেল। লোক তখন যন্ত্রটার আরেকটা চাবি টিপল বোধহয় খানিকটা মশলাপাতি মেশাতে। ওর স্বরের একটুখানি, তার গলার আওয়াজের এককোঁটা, মার সুরেলা কণ্ঠের একটু ছোঁওয়া, সকালের খবরের কাগজ পড়ে বাবার ছুঁড়ে দেওয়া একটা বিরক্তিসূচক অথবা আরামের ধ্বনি সব কিছু একসঙ্গে মিলেমিশে আমাদের চারপাশে ঘুরে ফিরে খেলে বেড়াতে লাগল। অবশেষে লোকটা আরেকটা সম্ভবত শেষ বোতামটা টিপল। কোন এক অতলান্ত গভীরতা থেকে একটা একটা স্বর ভেসে এল।
"নেফার তিতি" স্বরটা বলল।
টিমোথি জমে গেল, আমি জমে গেলাম, আগাথা নিজের আঙ্গুল নিয়ে নাড়াচাড়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালো।
"নেফার তিতি ? টিম বলল।
"তার মানে কি ?" আগাথা প্রশ্ন করল।
"আমি জানি।" বললাম আমি।
লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।
"নেফার তিতি," আমি ফিস ফিস করে বললাম, "একটা ইজিপ্টিয়ান কথা যার অর্থ

এখানে আছে একজন সুন্দর।"
"এখানে আছে একজন সুন্দর" টিমোথি কথাটার পুনরোক্তি করল।
"নে-ফা-র-তি-তি" আগাথা বলল।
তারপর আমরা গোধূলির আলোঘেরা সেই জায়গাটার দিকে ফিরলাম যেখান থেকে আওয়াজটা ভেসে এসেছিল।
সে নিশ্চয় সেখানে ছিল।
এবং তার গলার স্বরে সে সত্যিই সুন্দর।
তার কণ্ঠস্বরই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।
অবশ্য এমন নয় যে আমরা ওজন মাপজোক নিয়ে তর্কাতর্কি করিনি।
সে খুব রোগা হলে চলবে না, অথবা এমন মোটা যেন সে না হয় যাতে তার আড়ালে আমরা সবাই ঢাকা পড়ে যাই।
তার যে হাতদুটো আমাদের জড়িয়ে থাকবে, অসুখে পড়লে মাঝরাত্রে আমাদের কপালে হাত বুলিয়ে দেবে, তা যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ, কিংবা আগুনের মত গরম না হয়। স্নেহশীল মা মুরগীর দেহের আড়ালে সারা রাত ঘুমিয়ে থাকা ছোট্ট ছানার দেহের মত উষ্ণ হবে তার হাত।
সব কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারেই আমরা খুব খুঁত খুঁত করছিলাম। প্রচুর হৈচৈ-এর পর 'তার' চোখের রঙ কি হবে সেই তর্কে টিমোথিই জিতে গেল।
ঠাকুমার চুল? আগাথার ওপরেই ভার পড়ল, হাজার হাজার চুলের মধ্যে থেকে সেটা বেছে নেবার। আমরা সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছি দেখে নেহাত অনিচ্ছা সহকারে ও দায়িত্বটা গ্রহণ করল।
অতঃপর ফ্যান্টোসিনি কোম্পানিতে ঘুরে ঘুরে আমরা সওদা করে বেড়ালাম। বেলা পড়ে আসতে সেই কার্পেটের নদীটা আমাদের তীরে পেঁছে দিয়ে গেল।



তারপর চলল প্রতীক্ষার পালা। ফ্যান্টোসিনির লোকেরা বুঝেছিল ওরা আমাদের মন জয় করতে পারেনি। বিশেষ করে আগাথার, যে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বেদনাটাকেই যেন নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করত। প্রত্যেকদিন ভোরে ওয়াল-পেপারের ওপর আমরা আঁচড়ানো সব মূর্তি দেখতাম কতগুলো সুন্দর, কতগুলো দুঃস্বপ্ন।

আমরা প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

জুন মাস গেল।

অগাস্টও শেষ হতে চলল, অবশেষে ২৯ তারিখে, টিমোথি বলল "আমার যেন আজকে কিরকম কিরকম লাগছে।" "আমাদেরও," বললাম আমরা।

গতরাত্রে বাবার কথা, অদ্ভুত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকানো—এসবই হয়ত আমাদের মনে সন্দেহ তুলেছিল। হয়ত তা নয়, হয়ত রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের বিছানার পাশে কেঁদে কেঁদে করুণ সংবাদটা দিয়ে গিয়েছিল।

তিনজনে লনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগাথার সামনে আমি আর টিমোথি এমন ভাব করছিলাম যেন আমরা মোটেই উত্তেজিত নই।

আগাথাকে আমরা মোটেও পাত্তা দিচ্ছিলাম না। তাকাচ্ছিলামই না ওর দিকে, তা করলেই ও পালিয়ে যাবে। আমরা চুপচাপ বসে রইলাম, আকাশের দিকে তাকিয়ে। রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি যাচ্ছে, ওদের একটা হয়ত হঠাৎ আমাদের সেই আশ্চর্য উপহারটা দিয়ে যাবে, কিন্তু নাঃ কেউ এল না।

দুপুর হয়ে গেল, আমরা অলস ভাবে লনে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিলাম। ঠিক একটা বাজে, টিমোথির চোখ হঠাৎ পিটপিট করে উঠল।

এবং তারপরই ঘটনাটা ঘটল।

ফ্যান্টোমিসিনির লোকেরা যেন আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, তাই এক মুহূর্তে এতক্ষণের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল।

আমাদের মাথার ওপরের আকাশটা হঠাৎ দু-ফাঁক হয়ে গেল। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা হেলিকপ্টার, পৌরাণিক যুগের আকাশে উড়ে যাওয়া রথের মতন। আমাদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে, প্রচণ্ড হাওয়ায় চুল এলোমেলো করা শুকনো ঘাসপাতার ঝড় তুলে সেটা লনের ওপর নামল।

একটু পরেই হেলিকপ্টারটার নিচের দিকে একটা অংশ ড্রয়ারের মত খুলে গেল, ঘাসের ওপর আস্তে আস্তে একটা বড় মোড়ক এসে পড়ল। তারপর কোনও উচ্চবাচ্য না করে সোজা উড়ে চলে গেল।

টিমোথি আর আমি ওটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল কাঠের বাক্সটার ওপরে একটা শাবল আটকানো রয়েছে। তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে শাবলটা দিয়ে আমরা বাক্সটা সাবধানে চিরতে লাগলাম। আগাথা আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ, আগাথা কখনও কফিন দেখেনি। মা যখন আমাদের ফেলে চলে গেল তখনও না। শুধু চার্চে গিয়ে প্রার্থনা শুনেছিলাম আমরা।

অবশেষে বাক্সের ডালাটা খুলে গেল। আমাদের মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল।

বিশ্রী বাক্সটার ভেতরে মানুষের সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নের কল্পনার বাস্তব প্রতিমূর্তি

শুয়ে রয়েছে।
রয়েছে সাত থেকে সাতাত্তর সব বয়সের মানুষের জন্য একটা আদর্শ উপহার।
বাক্সের ভেতরে ছিল……
একটা মমি।
"ওঃ, নাঃ" টিমোথির চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।
"এ হোতে পারে না" আগাথা বলল।
"কিন্তু হয়েছে!"
"আমাদের নিজস্ব?"
"আমাদের।"
"কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে।"
"সে তো বোঝাই যাচ্ছে, ওরা বোধহয় এক্ষুনি এসে ওটা ফেরত নিয়ে যাবে।"
"ওরা এটা কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না।"
"ভগবান! ভগবান! ওটা কি সত্যিকারের সোনা? ওর ওপরে হাত দাও।"
"আমাকে হাত দিতে দাও।"
আমরা পাগলের মত বকবক করতে লাগলাম। মনে হয় আমার চোখ থেকে ক-ফোঁটা জল গিয়ে পড়ল বাক্সটার ভেতর।
"ওঃ জল লেগে ওর রঙ উঠে যাবে" আগাথা তাড়াতাড়ি জলটা মুছে দিল।
মমিটা ঢাকা ছিল একটা সোনা রঙের কিংবা সোনা চিত্রলিপি দিয়ে। তার ওপরে খোদাই করা ছিল সোনার মুখোস পরা একটা নারীমূর্তি। তার মুখের মৃদু মোহময় হাসি আমাদের মনে অদ্ভুত আনন্দাভুতি জাগিয়ে তুলছিল।
চিত্রলিপিটায় কত রকমের মূর্তি খোদাই করা। আমরা ঝুঁকে পড়লাম ওগুলোর ওপরে। লিপিগুলি অতীতের নয়, ভবিষ্যতের।
"দেখ, দেখ! এটা আমি ক্লাস সিক্সে।" আগাথা চেঁচিয়ে উঠল, ও এখন পড়ে ক্লাস ফাইভে।
"দেখছ এই মেয়েটাকে আমার মত চুল, আমার মতই একটা স্যুট পরে আছে?"
"দেখ ওটা আমি, হাইস্কুলে বার ক্লাসে বসে আছি" নয় বছরের টিম লাফিয়ে উঠল।
"ওটা আমার ছবি।" শান্তভাবে বললাম আমি "কলেজে পড়ছি, চোখে চশমা, একটু মোটা, নির্ঘাত ওটাই আমি ছ্যাঃ।"
আমরা আস্তে আস্তে চিত্রলিপি ভরা ঢাকনাটা খুলে ফেললাম। ভেতরে আসল মমিটা ছিল।
তাকে দেখতে চিত্রলিপিতে খোদাই করা মূর্তিটারই মত, কিন্তু আরও সুন্দর, আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয়, এবং আরো সব মমির মতন নোংরা জীর্ণ ন্যাকড়ার বদলে নতুন ঝলমলে লিনেনে ঢাকা।
তার লুকানো মুখের ওপরে একটা সোনালী মুখোস চিত্রলিপিটার মতন। কিন্তু

সেটার থেকে অনেক অল্পবয়স্ক, অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত।
আমরা আস্তে আস্তে লিনেনের ব্যাণ্ডেজগুলো খুলতে লাগলাম। গোটা লনটা একটু পরেই একটা লিনেনের পাহাড় হয়ে গেল।
ব্যাণ্ডেজের ভেতরে মহিলাটি শুয়েছিল।
"ওঃ না" আগাথা কেঁদে উঠল "এও মরে গেছে।"
"বোকা কোথাকার" আমি ওকে থামিয়ে দিলাম "ও মরাও নয়, বাঁচাও নয়। তোমার চাবিটা কই?"
"চাবি?"
"বুদ্ধু একটা" টিম বলল "আরে ওকে চালাবার জন্য সেই লোকটা একটা চাবি দিয়েছিল না?"
আগাথার হাতটা ঝট করে ওর নিজের জামার ভেতর ঢুকে গেল। একটা সুতোয় করে ওর চাবিটাও গলায় লুকিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল।
"নাও নাও চাবিটা লাগিয়ে দাও" টিম তাড়া মারল।
"কিন্তু কোথায়?"
"কী আশ্চর্য! কেন লোকটা তো বলেই দিয়েছে ওর ডানদিকের হাতে কিংবা বাঁদিকের কানে। দাও চাবিটা আমাকে দাও।"
আগাথার হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে টিম পাগলের মত তার নাকে, কানে, হাতে পায়ে, মাথায় সর্বত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগাবার চেষ্টা করল। শেষে কিছুটা বিরক্ত হয়ে কিছুটা ঠাট্টার ছলে শায়িত মহিলার নাভিতে চাপ দিল। সেই মুহূর্তেই ঃ বৈদ্যুতিক ঠাকুমার চোখ খুলে গেল। তার শরীরের ভেতর নানা রকম গুনগুন আওয়াজ হতে লাগল।
"ওঃ" আগাথা ঢোক গিলে বলল। "চাবিটা আমাকে দাও।"
"আমাকে দাও, আমাকে।" আমি চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ঘোরাতে লাগলাম। সুন্দরী সেই মহিলার মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।
"আমাকে!"
"আমাকে!"
"আমাকে।"
ঠাকুমা হঠাৎ উঠে বসল।
আমরা ঝট করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। যদিও আমরা জানতাম এক-অর্থে আমরাই তাকে বাঁচিয়েছি।
সে এই মুহূর্তে 'জন্মালো'।
ঠাকুমা মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকালো। তার মুখটা একটু ফাঁক হলো, তারপরই ঠাকুমা হেসে উঠল। প্রাণভরা উচ্ছ্বসিত হাসি। সে হাসিতে বিদ্রূপ ছিল না, ছিল আন্তরিকতা। সেই হাসি দিয়েই সে বলছিল এই পৃথিবীটা একটা অদ্ভুত, আশ্চর্য,

অবিশ্বাস্য রকমের পাগলামিতে ভরা অথচ সুন্দর জায়গা।
ঠাকুমা উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে আগাথা দূরে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল।
বৈদ্যুতিক মানুষটা এমন ভান করছিল যেন সে আগাথাকে দেখতেই পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে লনের ওপর দিয়ে হেঁটে সে ছায়াঘেরা রাস্তাটার ওপর গিয়ে দাঁড়ালো। তাকিয়ে রইল তার নতুন চোখ দুটো দিয়ে। তার বুকটা এমনভাবে ওঠা-নামা করছিল যে মনে হচ্ছিল সে বুঝি সত্যিই খোলা বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি ঘুরে এসে টিমোথির ওপর স্থির হয়ে গেল।
"তুমিই বোধহয়—?"
"টিমোথি, টিম" টিমোথি হেসে উত্তর দিল।
"আর তুমিই বোধহয় ?"
"টম" বললাম আমি।
কি চালাক সত্যিই এই ফ্যান্টোস্সিনির লোকগুলো। আমি জানি ওরা আমাদের নাম জানে, ঠাকুমাও নিশ্চয় জানে কিন্তু ভান করছে যেন জানে না। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। আমরা যেন তার শিক্ষক, কি বুদ্ধিমান ঐ লোকগুলো।
"আচ্ছা আরেকজন ছেলে ছিল না ?" মহিলা জানতে চাইলো।
"মেয়ে!" দূরে কোথা থেকে একটা বিরক্তি-মাখা স্বর ভেসে এল।
"যার নাম অ্যালিসিয়া ?"
"আগাথা !" দূর থেকে ভেসে আসা স্বরটা ক্রমে রাগে পরিণত হচ্ছে।
"ঠিক ঠিক অ্যালজারনন।"
"আগাথা" আমাদের বোন রাগে ফেটে পড়ল।
"আগাথা" মহিলাটি গভীর ভালবাসার সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করল। "তাহলে আগাথা, টিমোথি, টমাস এদিকে এস, আমি তোমাদের ভাল করে দেখি।"
"না" আমি আর টম বললাম "আগে আমরা তোমাকে দেখি।"
আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তার হৃদয়ের উচ্চতাকে আমরা এখান থেকে আঁচ করতে পারছিলাম। সে যেন শরতের শিউলি-ঝরা ভোর যখন সবকিছুই থাকে পবিত্র, সুন্দর !
"আরে তোমার চোখ দুটো…" তার অপরূপ দুষ্প্রাপ্য মণির মতো চোখের দিকে তাকিয়ে টিম চেঁচিয়ে উঠল। "ও দুটো ঠিক যেন…ঠিক যেন…"
পৃথিবীর সব সেরা চোখের অধিকারিণী মহিলাটি টিমোথির দিকে ফিরল "ঠিক যেন কী ?"
"ঠিক আমার প্রিয়।"
"বাঃ দারুণ এর থেকে ভাল ব্যাপার আর কী হতে পারে ?" মহিলাটি বলল।
তার দৃষ্টি এবার আমাকে ছুঁয়ে গেল "আর টমবাবু, তুমি ?"
"আমি কি ?"

"মানে আমরা কি করে বন্ধু হতে পারি সেটা বল ? আমাদের যদি একসঙ্গে থাকতেই হয় তাহলে সেটা খুব জরুরী..."
"ইয়ে, মানে আমি..." আমি চুপ করে গেলাম।
"তুমি হচ্ছ দাঁতে চিটেগুড় আটকে যাওয়া একটা কুকুর, যে বেচারা প্রাণপণে ডাকতে চাইছে কিন্তু পারছে না।"
আমি ফিক্ করে হেসে ফেললাম। ঠাকুমা বাগানের দিকে ফিরল। সামনেই লনের ওপর আমার পুরানো ঘুড়িটা লাট খেয়ে পড়ে ছিল। ঠাকুমা ওটার দিকে গেল। কি ব্যাপার সুতো ছিঁড়ে গেছে ? এহেঃ, সুতো-সুদ্ধ লাটাইটাই হারিয়ে গেছে ?"
সে নিচু হয়ে ঘুড়িটা কুড়িয়ে নিল। আমি বুঝতে পারলাম না এবার কি হবে। রোবট ঠাকুমা কি আমাদের জন্য ঘুড়ি ওড়াবে ? হাতে ঘুড়িটাকে ধরে ঠাকুমা বলল।
"যা উড়ে যা।"
এবং ঘুড়ি উড়তে শুরু করল। দেখি তার আঙুলের ডগা থেকে পাতলা মাকড়শার জালের মতো একটা সুতো বেরিয়ে এসে ঘুড়িটাকে ওড়াচ্ছে। সুতোটা এত পাতলা যে প্রায় নজরেই পড়ছে না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওটা একশ, না তিনশ, না এক হাজার ফিট উঁচুতে উড়ে গেল।
"কী মজা কী মজা," টিমোথি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। আগাথা দূরে দাঁড়িয়েই মহানন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আমি একজন তের বছরের ছেলে অত অল্পে আমার হৈ চৈ করা সাজে না। আমি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ শুনি আমার মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল, 'হুররে।' আমি চিৎকারটার সঙ্গে লাফালাফি হৈ চৈ করে আর নাচতে লাগলাম। ইস্ আমার যদি অমন একটা সুতো বেরোনো আঙুল থাকত, তাহলে আমি কোন কিছুই পরোয়া করতাম না।
"তোমরা বুঝি ভাবছ এটা অনেক উঁচুতে চলে গেছে ?" ঠাকুমা বলল "তাহলে এবার দেখ।"
হি-স্-স্, গুনগুন নানা রকম আওয়াজ করতে সুতোটা আরও দ্রুত বেরোতে লাগল ঠাকুমার আঙুল থেকে। ঘুড়িটা একলাফে আরও এক হাজার ফিট ওপড়ে উঠে গেল, তারপর আরও এক হাজার। তারপর উঠতেই থাকল যতক্ষণ না সেটা একটাছোট্ট লাল বিন্দুতে পরিণত হয়।
"যাঃ এমন হতেই পারে না" বললাম আমি।
"খুব পারে।" ঠাকুমা শান্ত গলায় বলল। "আমার যখন ইচ্ছে, আমি এমন করতে পারি। এর ভেতর মাকড়শার মতন একটা তরল পদার্থ আছে। হাওয়ার সংস্পর্শে এলেই জমে শক্ত হয়ে যায়।"
ঠাকুমা ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল "এবার তাহলে অ্যাবিতোইল –?"
"আগাথা ?" স্পষ্ট উত্তর ভেসে এল দূর থেকে "আগাথা" ঠাকুমা নরম গলায় উচ্চারণ করল। তারপর ঘুড়ির সুতোটা ছিঁড়ে জড়াতে লাগল লাটাইতে। চক্‌চকে চোখে

আমি দেখছিলাম। ওঃ পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ঘুড়ির সুতো। আমার বন্ধুরা যখন এটা দেখবে না – হিংসায় ওদের মুখগুলো কালো কালো হাঁড়ির মত হয়ে যাবে।
"আগাথা ?" ঠাকুমা আবার বলল।
"না" বলল অগাথা।
"না" দূরে কোথাও কথাটার প্রতিধ্বনি উঠল।
"আমরা নিশ্চয় কোন ভাবে –"
"না, না, আমরা কিছুতেই বন্ধু হব না।" চেঁচিয়ে উঠল আগাথা।
"কিছুতেই বন্ধু হব না" আবার প্রতিধ্বনি উঠল। আমি আর টিমোথি একসঙ্গে চমকে উঠলাম আরে! প্রতিধ্বনিটা কোত্থেকে আসছে? এমনকি আগাথাও অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল এমনিতে প্রতিধ্বনি হয় না, তবে?
ওমা হঠাৎ দেখি ঠাকুমা তার দুই হাতের চেটো একসঙ্গে নমস্কারের ভঙ্গিতে মুড়ে রেখেছে। তারপর সেই ঝিনুকের মতো হাতটা একটু ফাঁক করছে অমনি প্রতিধ্বনির আওয়াজ আসছে "বন্ধু– হব না—কিছুতেই বন্ধু–হব না —হব না—"
আমরা দুজনে লনে বসে পড়লাম ওটা শোনার জন্য।
"না, না" আগাথা চেঁচিয়ে উঠে বাড়ির ভেতর দিকে দৌড়ল, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল দমাস্ করে।
"বন্ধ-বন্ধু" ঠাকুমার হাতের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠল, তারপর একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল।
সেটা ছিল প্রথম দিন।



তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ ঠাকুমা উজ্জ্বল সূর্যের মত তার বৃত্তে ঘুরে বেড়াতো। আমরা তার চারপাশে তারই আলোয় উদ্ভাসিত কতগুলো গ্রহের মতো পাক খেতে লাগলাম। আগাথাও একটু একটু করে তার আকর্ষণের মধ্যে আসছিল। আমরা যখন খেলতাম সে আমাদের সঙ্গে ছুটত না পেছন পেছন হেঁটে আসত। ঠাকুমাকে সে দেখত না, তাকিয়ে থাকত। তার আঙুল ছোঁয়াত, ধরত না। দশ দিনের মাথায় আগাথা আর পালাত না। সে আমাদের থেকে একটু দূরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, কিংবা গাছের নিচে চেয়ার পেতে বসে থাকত। আমরা বেড়াতে গেলে সেও দশ-পা দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করে আসত।

আর ঠাকুমা ? সে কখনও কোনও ব্যাপারে আগাথার ওপর জোর খাটাত না বা দলে টানার জন্য হুড়োহুড়ি কিংবা উপেক্ষা করত না। সে দারুণ সুন্দর সুন্দর সব খাবার-দাবার কেক ইত্যাদি রান্না করে সারা বাড়ির এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রাখত। তার ভুরভুরে গন্ধ গিয়ে ধাক্কা মারত দশ বছরের একটা লোভী নাকে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খাবারের প্লেটগুলো খালি হয়ে যেত। মিষ্টি রুটি, কেক সব অদৃশ্য হয়ে যেত কোনও রকম ধন্যবাদ ছাড়াই। আগাথাকে দেখা যেত সিঁড়ি দিয়ে নেমে দূরে মিলিয়ে যেতে। তার মুখে লেগে থাকত কেকের গুঁড়ো।

সবচেয়ে, অদ্ভুত, সুন্দর, আশ্চর্য মিষ্টি ঘটনাটা হল বৈদ্যুতিক ঠাকুমা আমাদের সবাইকে সমানভাবে যত্ন-আত্তি করত।

সে মন দিয়ে, সত্যিই মন দিয়ে আমাদের কথা শুনত। সে দাড়ি, কমা, ফুলস্টপ সহ প্রত্যেকটি কথা এমনকি শব্দও মনে রাখতে পারত। আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাণ্ডকারখানা তার মনে জমা হয়ে থাকত। কারণ যে-কোনও সময়েই, অমুক দিন, অমুক সময়ে, অমুক মুহূর্তে আমরা কি করেছিলাম বা বলেছিলাম সেটা জানা আমাদের খুব দরকার হয়ে পড়তে পারে।

মাঝে মাঝেই আমরা তাকে পরীক্ষা করতাম। অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আজে-বাজে নানান বিষয়ে বক্ বক্ করতাম। তারপর হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বলতাম ঃ

"বলত এক্ষুনি আমি কি বললাম ?"

"এই ইয়ে—"

"বলে ফেল বলে ফেল চুপ করে থেকো না।"

"আমার মনে হয়—" ঠাকুমা বিড় বিড় করল "দাঁড়াও ওটা এখানে আছে।" বলেই হাতব্যাগ ঘেঁটে একটা টাটকা মিষ্টি বার করে আমার হাতে দিল। সেটা তখনও যথেষ্ট গরম আছে। মিষ্টিটা ভাঙতেই তার ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে এল। তাতে লেখা আছে ঃ

"—গোটা পশ্চিমাঞ্চলের বাই-সাইকেল চ্যাম্পিয়ন! বলত—এক্ষুনি আমি কি বললাম ? বলে ফেল, বলে ফেল চুপ করে থেকো না।"

আমার মুখ ঝুলে পড়ল।

"তুমি কি করে এটা করলে ?"

"সে আছে একটা গোপনীয় ব্যাপার, নাও আরেকটা মিষ্টি খাও।"

মিষ্টিটা ভেঙ্গে খেতে যেতেই তার ভেতর থেকে আরেকটা কাগজ বেরোলো, তাতে লেখা ছিল ঃ

"তুমি কি করে এটা করলে ?"

কাগজটা ফেলে দিয়ে দারুণ ভাল মিষ্টিটা মুখে ফেললাম।

"তাহলে ?" ঠাকুমা বলল।

"তুমি একজন ভাল রাঁধুনি" আমি বললাম তারপর একসঙ্গে হেসে উঠে দৌড়াতে

লাগলাম।

এবং সেটা আরেকটা দারুণ ব্যাপার। ঠাকুমা কখনও দৌড়ে এগিয়ে যেত না, কখনও জিতত না ঠিক যেখানে থাকলে ছেলেদের আত্মসম্মানে ঘা পড়ে না সেখানে থাকত। কোনও মেয়ে যদি কোনও ছেলেকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যায়, কিংবা অনেক পেছনে পড়ে থাকে তাহলে হবে না। তাকে ঠিক একটু পেছন পেছন আসতে হবে। আমরা অর্থাৎ পুরুষরা এতে প্রচন্ড গর্ব অনুভব করি।

অতএব এই ভাবেই আমরা দৌড়াতাম, এবং মিনিটে এক মাইল বেগে কথা বলতাম।

এবার ঠাকুমার সবচেয়ে আশ্চর্য দিকটা আপনাদের বলি। ঘটনাটা আমি ধরতেই পারতাম না যদি না টিমোথি ঠাকুমার কতগুলো ছবি তুলত এবং আমার তোলা ছবির সঙ্গে আমি সেগুলোর তুলনা করতে যেতাম। নিশ্চিত হবার জন্য আমি আগাথাকে পাঠালাম ঠাকুমার কয়েকটি ছবি তোলার জন্য, তারপর তিনজনের ছবি নিয়ে মেলাতে বসলাম। টিমোথি আর আগাথাকে আমি ঘটনাটা বলিনি, তাতে মজাটা নষ্ট হয়ে যেত।

ঠাকুমাকে প্রত্যেকটা ছবিতে আলাদা আলাদা লাগে।

"আলাদা?" নিজেকেই আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"নিশ্চয় এই দেখ এই ছবিটা – ঠাকুমা এটায় আগাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর কী আশ্চর্য—ঠাকুমাকে ঠিক আগাথার মতো দেখতে লাগছে!"

"আর এইটায়, টিমোথির কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুমার মুখটা একেবারে টিমোথির আর এইটায়? রামোঃ আমার মতই বিশ্রী দেখতে ঠাকুমা আমার সঙ্গে দৌড়চ্ছে।"

আমি স্থাণুর মত বসে রইলাম, ছবিগুলো হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

ওঃ, ঠাকুমা কী ভীষণ ভাল কী ভীষণ বুদ্ধিমতী।

ফ্যান্টোস্সিনির মানুষ তৈরি-করা মানুষগুলো কি চালাক, কি ভালো।

আমি চুপচাপ নিচে নেমে গেলাম। একই ঘরে ঠাকুমার সঙ্গে শান্তভাবে বসে আগাথা অ্যালজেব্রার অঙ্ক করছিল। এখন ওদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলেছে। ঠাকুমা এখনও প্রতীক্ষা করে আছে আগাথার জন্য।

আমি ঘরে ঢুকলাম। ঠাকুমার দিকে কড়া নজর রেখেছিলাম। ঠাকুমা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে, আমার মতো হয়ে যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে। আগাথার দিকে তাকিয়ে থাকা তার নীল চোখ দুটো আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে না?

সবচেয়ে বড় কথা আমাকে "শুভসন্ধ্যা, তোমার হোমওয়ার্ক কোথায়?" ইত্যাকার কথা বলার সময়ে তার কমনীয় মুখের দুপাশের হাতদুটো হঠাৎ উঁচু হয়ে গেল না? যদিও আমরা তিন ভাই বোন কিন্তু আমাদের চেহারায় মিল মোটেই নেই। আগাথা একেবারে একজন ইংরেজ মেয়ে। টিমোথি 'মা'র' পরিবারের দিকের ইতালীয় ধাঁচ পেয়েছে। আর আমি?

বাবার ঠাকুরদার মা যিনি ভিয়েনার মেয়ে ছিলেন। তাঁর ধারায় আমার চেহারায় স্লাভ প্রভাব খুব বেশি, বিশেষ করে আমার নাকটাতো একেবারে তাতারদের মতো। তাহলে বুঝতে পারছেন ঠাকুমার পরিবর্তন কত সহজেই আমার নজরে পড়ত?

কী করে ফ্যান্টোম্সিনির লোকেরা এই অসাধ্য সাধন করেছে আমি জানি না। জানতে চাই না। শুধু বুঝি গভীর রাত্রে সে যখন আমাদের এসে শিয়রে দাঁড়ায়। আমাদের কপালে হাত বুলিয়ে দেয় প্রত্যেক বার আলাদা ভাবে সে তার আসল 'মা' হয়ে যায়।

যখন আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে গল্প করতাম তখন ঠাকুমার পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হত। তাতে কিছু যায় আসে না এটাই যথেষ্ট যে আমাদের সান্নিধ্যে এসে তার চোখে মুখে ভালবাসার রঙ লাগত। তার বাহুযুগল পরম স্নেহে আমাদের বেষ্টন করতে চায়।

অবশ্যই আগাথা তার বাহুবেষ্টনে ধরা দেয় না।

"আগামেনন..."

এটা ঠাকুমার রোজকার কাজ হয়ে গেছে। আগাথাও তার কথায় বিশেষ কিছু মনে করে না। যদিও ভান করে সে-রকমই।

"আমার মনে হয়" টিমোথি একদিন বলল "ঠাকুমাকে আগাথার ভাল লাগতে শুরু করেছে।"

"টস্" বললাম আমি।

"টস্? কোত্থেকে বানালে শব্দটা শুনি?'

"বানাইনি, ঠাকুমা কাল রাত্রে আমাকে 'ডিকেন্সের' কয়েকটা গল্প পড়ে শুনিয়েছে, তাতে ঐ কথাগুলো ছিল 'টস', 'হামবাগ', 'ব্লাস্ট', 'শয়তান তোমাকে নিক' কিন্তু টিম তোমার বয়সের পক্ষে তুমি অনেক বেশী বুদ্ধিমান।"

"বুদ্ধিমান না হাতি! আগাথা দিন দিন যতই ঠাকুমাকে পছন্দ করছে, তার জন্য ততই নিজেকে ঘেন্না করছে তা জানো? প্রত্যেকদিনের শেষে নিজের ওপর একটা ঘেন্নার পাহাড় জমাচ্ছে ও।"

"কাউকে কেউ কি একই সঙ্গে ভালবাসতে আর ঘেন্না করতে পারে?"

"নিশ্চয় পারে।"

আমি লক্ষ্য করে করে যেতে লাগলাম কীভাবে ঠাকুমা সেই মেয়েটার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় জেতে।

খাওয়া দাওয়ার কথাই বা কি বলব? ডিনার, লাঞ্চ, কিংবা জলখাবার যাই হোক না কেন সবসময়েই কিছু না কিছু নতুন খাবার আমাদের পাতে পরিবেশিত হত। আমাদের কখনও জিজ্ঞেস করা হত না তোমরা কি খাবে। ছোটরা কখনই ঠিক করতে পারে না তারা কি খাবে। আগে থেকে যদি তাদের বলা হয় অমুক রান্না করব তারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। এই খাওয়া নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে সব পরিবারেই

চলে নিত্য যুদ্ধ। ঠাকুমা কিন্তু বিনা রণে রোজই এই যুদ্ধে জিতে যেত।
এই নাও নয় নাম্বার আশ্চর্য জলখাবার, এই আসছে সাতাত্তর নম্বর অজানা লাঞ্চ। এই নাও নতুন ধরনের খাবার, বাসের সিট, প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, আর ঠোঙা মিশিয়ে তৈরি। খাবার পর অবশ্যই মুখ ধুয়ে নিও ভাল করে তা না হলে ওর বাজে স্বাদ সারাদিন মুখে লেগে থাকবে। এই এসে গেছে ডিনার বাপরে! যখন রান্না করছিলাম তখন দুর্গন্ধের চোটে এটাকে আমার ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।
এবং সেই সব খাদ্য খাবার জন্য আমরা কাড়াকাড়ি করে খেতাম।
কোনও কোনও দিন আগাথা আমাদের সঙ্গে খেতে বসত না। তখন খাবার দাবার-গুলো উপযুক্ত ঘুষ সহকারে ওর ঘরের দরজার বাইরে রেখে দেওয়া হোত। খাবার ভর্তি ট্রেটা একটু নড়েচড়ে উঠত পরমুহূর্তেই ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেত।
কখনও কখনও ও এসে ঝট করে প্লেট থেকে কেক বিস্কুট তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যেত।
"আগাথা!" বাবা ডেকে উঠত।
"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" ঠাকুমা বাবাকে থামিয়ে দিত "সব ঠিক হয়ে যাবে একটু সময় লাগছে, এই আর কী।"
"ওর কি হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "মেয়েটার মাথায় পোকা আছে।" টিম বলল।
"না বেচারী ভয় পাচ্ছে।" ঠাকুমা উত্তর দিল।
"কাকে, তোমাকে?" আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।
"ঠিক আমাকে নয়, আমার কিছুতে।"
"কিন্তু তুমি ত ওর কোনও ক্ষতি করতে পার না?"
"না পারি না, কিন্তু আগাথা ভাবছে আমি পারি। ওর ভয়ের কারণটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। না পারলে"—ঠাকুমার চোখদুটো একটু পিটপিট করে উঠল "আমার মাথাটা ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে রাখব।"
আমরা হৈহৈ করে হেসে উঠলাম। আগাথা দূরে কোথাও লুকিয়ে ছিল।
আমাদের সবইকে খাবার দিয়ে ঠাকুমা একটা চেয়ারে বসে খাওয়ার মত ভান করত। চামচে করে খাবার তুলে মুখে দিত, এবং সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যেত। কোথায় জানি না।
"এই খাবারটা আমি আগে খেয়েছি।" বাবা বলল। "একটা ছোট্ট ফরাসী রেস্তোরায় বসে, সে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগে।"
বাবার চোখদুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল।
"তুমি কি করে এসব কর?" বাবা ঠাকুমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, তার সামনে বসা সেই অদ্ভুত সৃষ্টি, সেই মানুষ অথবা নারী (?)র দিকে ফিরে।
ঠাকুমা আস্তে আস্তে উত্তর দিল। "আমাকে ভালবাসার জন্য, দেবার জন্য তৈরি করা

হয়েছে। আমি তোমাদের কতখানি দিই। কি দিই জানিনা কিন্তু দিয়েই চলি। তোমরা জানতে চাও আমি কি? আমি একটা মেশিন, কিন্তু সাধারণ মেশিনের থেকে বেশি কিছু। যেসব ব্যক্তিরা দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনালব্ধ জ্ঞান দিয়ে আমাকে সৃষ্টি করেছে আমি তাদের মিলিত সত্তা। আমি একটা আশ্চর্য খেলনা।

"আশ্চর্য" বাবা বলল, "আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন শুনতাম এই সব মানব শ্রেণীর রোবটরা বিপদজনক এদের সৃষ্টি না করাই বাঞ্ছনীয়।"

"কিছু কিছু মেশিন সত্যিই বিপদজনক, কিছু নয়। সবটাই নির্ভর করে তাদের কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, কাজে লাগানো হচ্ছে তার ওপর। ভাল্লুক ধরার ফাঁদও একটা যন্ত্র যেটা কষ্ট দেয় চোখে জল আনে। রাইফেলও একটা যন্ত্র যেটা রক্ত ঝরায়, প্রাণ নেয়। আমি ভাল্লুক ধরা ফাঁদ নই, রাইফেলও নই আমি একজন ঠাকুমা মেশিন, যেটা মেশিনের থেকে বেশি কিছু।"

"কিন্তু" বাবা বলল "তুমি কি ভালবাসতে পার?"

"যদি সকলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাই ভালবাসা হয়, আমি ভালবাসতে পারি।"

"যদি তাদের মনকে জানাই ভালবাসা হয় আমি ভালবাসি।"

"যদি তাদের খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখা, ভাল ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করাই ভালবাসা হয় আমি ভালবাসি।"

"শুধু তাই নয় আমি একই সময়ে একই সঙ্গে তোমাদের চারজনের দিকে সমান নজর দিই। তোমরা যদি একসঙ্গে কথা বল, তাহলে আমি আলাদা আলাদা চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেকের কথা ধরে শুনি। তোমাদের জন্য আমার হৃদয়ে সমান জায়গা রয়েছে, কেউ বেশি পাবে না কেউ কম পাবে না। যদি তোমরা বিশ্বাস কর, তাহলে শোন আমি তোমাদের সবাইকে ভালবাসি।"

"আমি বিশ্বাস করি না।" চিৎকার করে বলল আগাথা।

এমনকি সদা নির্লিপ্ত ঠাকুমাও তার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

"আমাকে তোমার ভালবাসার দরকার নেই, তুমি আমাকে ভালবাসবে না, একদম না, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারি না।" আগাথা দূরে দাঁড়িয়ে বলে চলল "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কেউ আমাকে ভালবাসে না, বাসবে না। সেওতো বলেছিল আমাকে নাকি সে খু-উ-ব ভালবাসে কিন্তু সে মিথ্যে কথা বলেছিল, মিথ্যে কথা।"

"আগাথা!" বাবা রেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"সে? সে মানে কে?" ঠাকুমা আগাথাকে জিজ্ঞেস করল।

"কে আবার 'মা', 'মা'।" আগাথা কেঁপে ফুঁপিয়ে উঠল। "আমি তোমায় ভালবাসি মা বলেছিল, মিথ্যুক, এক নম্বরের মিথ্যুক। আর তুমিতো একটা মেশিন, তুমি ডবল মিথ্যুক।"

আগাথা টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে চলে গেল।
বাবা ওর পেছনে যেতে যাচ্ছিল, ঠাকুমা বাবাকে থামিয়ে দিল "আমি দেখছি।"
ঠাকুমা আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল, তারপর দরজার কাছে পেঁছে হঠাৎ দ্রুত দৌড়ে হ্যাঁ হরিণের মত বেগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।
আগাথা পাগলের মত হনহনিয়ে হাঁটছিল, আমরা চেঁচাতে চেঁচাতে ওর পেছনে দৌড়লাম। আমাদের দেখে ও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল, তারপর মোড় ঘুরে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা মাঝ রাস্তায় গিয়ে পড়ল। এবং ঠিক তক্ষুনি একটা গাড়ি দানবের মত হুড়মুড়িয়ে ধেয়ে এল আগাথার দিকে। প্রচণ্ড হর্নের আওয়াজে ভড়কে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল, একটুও নড়ল না। গাড়িটা প্রাণপণে ব্রেক কষার চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে অনেক অনেক দেরী হয়ে গেছে। হঠাৎ আমাদের মাঝখান থেকে একটা বিদ্যুত ঝলকে উঠে ছুটে গেল আগাথার দিকে। ঠাকুমা! আগাথাকে এক ধাক্কায় সে আমাদের আদরের বৈদ্যুতিক ঠাকুমাকে প্রচন্ড এক ধাক্কা মেরে গাড়িটা সামনে গিয়ে থামল। ঘুরপাক খেতে খেতে ঠাকুমা গিয়ে ছিটকে পড়ল অনেকটা দূরে। গাড়িটা সরে যেতে দেখতে পেলাম আগাথা পড়ে আছে, আর পঞ্চাশ গজ দূরে এলিয়ে পড়ে আছে ঠাকুমার নিস্পন্দ দেহটা।
আমরা যেন বরফে জমে গেছি। পাগুলো গেঁথে গেছে মাটির সঙ্গে। আগাথা একবার উঠে বসার চেষ্টা করে আবার পড়ে গেল, তবু আমরা নড়তে পারলাম না। একমনে শুধু প্রার্থনা করছিলাম ও ভগবান, ভগবান, ভগবান।
আগাথা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ঠাকুমার মুখটা তুলে ধরে। যে মুখটা হাসতে চেয়েছিল, আমাদের হাসাতে চেয়েছিল কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়েছে চিরতরে।
আগাথার দুচোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছিল, টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।
আমি একপা, দু পা করে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। মাথাটা অসহায় ভাবে ঝুঁকিয়ে ও বিড়বিড় করছিল। আমার ভয় হতে লাগল ওকি আর কোনদিনও স্বাভাবিক হোতে পারবে? "আমি যা বলেছিলাম—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—সব মিথ্যুক—সেই আরেকজনের মত - মার মত—মার মত মিথ্যুক -আরেকটা -আরেকটা -'
আমি হাঁটুগেড়ে বসে ঠাকুমাকে চিৎ করে দিলাম। যদিও ঠাকুমার দেহ অবিকৃত আছে তবু জানি ঠাকুমা নেই, ঠাকুমা মরে গেছে। আমি উঠে আগাথার পিঠে হাত রাখলাম।
বাবা আর টিমোথি এসে ঠাকুমার দেহের পাশে হাঁটুমুড়ে বসল। ঠিক যেন মৃতদেহকে ঘিরে তার আত্মীয়দের ভীড়ের মত।
"আরেকটা—"আগাথা বলল।
"আরেকটা কি?" আমি নরম গলায় জানতে চাইলাম।
"আরেকটা মৃত্যু, মার মত।" ও বলল।
"মা?"

"ও মাগো," আগাথা হঠাৎ কেঁদে উঠল। তারপর মাটিতে আছড়ে পড়ল। মা মরে গেছে, মা মরে গেছে। এখন ঠাকুমাও মরে গেল, কেন—কেন—? ঠাকুমা যে বলেছিল আমাদের সর্বদা ভালভাসবে, কাছে থাকবে তবে কেন ঠাকুমা মরে গেল? আমি তোমাকে ঘেন্না করি, ঘেন্না করি সব মিথ্যুকদের। কেউ আমাকে ভালবাসে না, কেউ না।"

"ঠিকই তো, আমার এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। সত্যিই কি বোকা আমি।" একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল।

স্বরটা আমাদের এত পরিচিত, এত আপন যে আমরা চমকে উঠলাম, ফিরে তাকালাম। আগাথার চোখ গোল গোল হয়ে গেছে, মুখ হাঁ-করা।

"সত্যি আমি একটা আস্ত বুদ্ধু" আমার ঘিরে থাকা ভীড়ের মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঠাকুমা।

"ঠাকুমা" আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঠাকুমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, মুখ নিচু করে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

"তুমি মরে গেছ" আগাথা বলল "গাড়িটা তোমাকে—"

"ধাক্কা দিয়েছিল" ঠাকুমা বলল "তাতে কি? কিছুক্ষণের জন্য আমার শরীরে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরই নিজেকে নেড়েনেড়ে ঠিকঠাক করে এক পোঁচ নতুন রং লাগিয়ে দিব্যি কেমন উঠে বসেছি।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয়—" আগাথা বলল।

"ঠিকইতো, ঠিকইতো" ঠাকুমা বলল "অতজোরে কাউকে গাড়িতে ধাক্কা খেতে দেখলে, অমন ছিটকে পড়তে দেখলে, যে কোনও লোকই তাই ভাববে। কিন্তু লক্ষ্মী সোনা আগাথা, আমার বেলায়তো সেটা ঘটবে না। এতক্ষণে বুঝেছি কেন তুমি আমায় ভয় পেতে, বিশ্বাস করতে না। আমার উচিত ছিল এটা বোঝা, তোমাকে প্রমাণ দেওয়া, ভয় ভাঙ্গিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে, বাচ্চাদের মানুষ করা নামে একটা বই-এর কথা। এক ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন। অনেকেই তাঁর একটা উক্তিতে হেসে ফেটে পড়েছিল। সেটা হল এই যে "বাবা, মায়েরা আপনারা যাই করুন না কেন দয়া করে মারা যাবেন না। তাহলে আপনার সন্তানরা কোনও দিনও আপনাকে ক্ষমা করেবে না।"

"কোনও দিন ক্ষমা করবে না।" আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন ফিস্‌ফিস করল।

"সত্যিই, বাচ্চারা কি করেই বা বুঝবে, যে তাদের এত ভালবাসত, যত্ন করত, সে একদিন হুট্‌ করে কোথায় চলে গেল, আর এল না, কোন খবর দিল না, একদিনও দেখা করল না?"

"বাচ্চারা বোঝেনা" বাবা বলল।

"তাহলে আবিহেইল?"

"আগাথা।"

"আগাথা—তুমি বুঝতে পেরেছো, আমি বরাবর তোমাদের সঙ্গেই থাকব, কোথাও যাব না, মরব না ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি," আগাথা কেঁদে উঠে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম আমাদের সামনে দিয়ে গাড়ির স্রোত বয়ে যেতে লাগল।

অতএব গল্প শেষ।

ঠিক শেষ নয় আরেকটু আছে। ঠাকুমার সঙ্গে আমাদের দিনগুলো ঝড়ের বেগে কেটে যেতে লাগল। ঠাকুমা, আগাথা অ্যাগামেনন অ্যাবিতেইল, টিমোথি, আমি এবং বাবা একসঙ্গে একসঙ্গে একাত্ম হয়ে।

অবশেষে আমরা একে একে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকতে চললাম। গ্রীষ্মের শেষে কোনও এক ভোরে আমরা দেখলাম ঠাকুমা এক গাদা মোরক, সেলাই, স্যুটকেশ নিয়ে বসে বসে গোছাচ্ছে। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলাম।

"ঠাকুমা! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"এক অর্থে কলেজে যাচ্ছি সোনা। তোমাদেরই মত। গুইডো ফ্যাণ্টোস্সিনিতে ফিরে যাচ্ছি আমার পরিবারে।"

"তোমার পরিবারে ? সেখানে কি আছে ?"

"আমার রোবট ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন।"

"তারা কি করবে, তাদের নিয়ে কি করা হবে ?"

"সেটা নির্ভর করছে। যদি কখনও, কাউকে কোনও কাজে লাগানো হয়, কাউকে ভেঙ্গে তার যন্ত্রপাতি দিয়ে নতুন ঠাকুমা বানানো হয়—"

"না—ওরা তোমাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না।" আগাথা কেঁদে উঠল।

'কিছুতেই না, কিছুতেই না," টম আর আমি আর্ত চিৎকার করে উঠলাম।

"আমাদের সব টাকা আমরা দিয়ে দেব, দিয়ে তোমাকে—?"

ঠাকুমা আগাথার দিকে তাকালো "তাহলে তোমাদের বলি ফ্যাণ্টোস্সিনি কোম্পানিতে খুব অল্প টাকায় একটা ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। মৃদু আলোয় ভরা একটা সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর। সেখানে আমার মত আরও অনেক ঠাকুমা একসঙ্গে বসে কথা বলে। আলোচনা করে ব্যাখ্যা করে তারা পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে কি শিখেছে জেনেছে। আমি সেখানেই যাব, তাদের বলব আমার এই পরিবার থেকে টিম, টম আগাথার কাছে আমি কত কিছু শিখেছে—"

"কিন্তু তুমিইতো আমাদের সবকিছু শেখালে।"

"তা নয়" ঠাকুমা বলল "শিক্ষা কি কখনও এক তরফা হয় ? তোমাদের সঙ্গে বছরের পর বছর কাটিয়ে আমরা যা শিখি, জানি, বুঝি, সেই ঘরটায় বসে তাই রোমন্থন করি। আস্তে আস্তে বেড়ে চলে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি। সেই অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাণ্টোস্সিনি তৈরি করবে আরও আদর্শ সব ঠাকুমা।

আমি বুঝতে পারলাম, একটা ছোট্ট আধা অন্ধকার ঘরে বসে ঠাকুমারা শুধু কথা বলে যাবে, কথা বলে যাবে। পিনোক্সিয়ো নামে সেই কাঠের পুতুলটার মত, পুতুল থেকে মনুষ্যত্ব লাভের আশায় তারা প্রতীক্ষা করে যাবে, করেই যাবে অনন্তকাল—সে দিনটা আর কোনও দিনও আসবে না।

ঠাকুমা বুঝতে পেরেছিল আমার চোখের ভাষা, তাই বলল "দেখা যাক কী হয়।"

"ও ঠাকুমা তুমি বেঁচে থাকবে, নিশ্চয় বেঁচে থাকবে, আমাদের কাছে তুমি চিরদিন বেঁচে থাকবে।" আগাথা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আমরা ঠাকুমাকে জড়াজড়ি করে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না সেই হেলিকপ্টারটা এসে ঠাকুমাকে নিয়ে গেল অনেক অনেক দূরের কোনও কলেজে। তার শেষ কথা ভেসে এল ঃ

"যখন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তোমাদের দ্বিতীয় শৈশবে প্রবেশ করবে, অসহায় হয়ে পড়বে, তোমাদের খাওয়ানোর জন্য, দেখাশুনার জন্য একজন কাউকে দরকার হবে তখন আমাকে ডেকো। আমি নিশ্চয় আসব। আমাদের পরিবার এই নার্সারিকে আমরা আবার চালু করব, ভয় পেয়ো না। বিদায়, বিদায়।"

"ওঃ আমরা কোনদিনও বৃদ্ধ হব না" আমরা একসঙ্গে কেঁদে উঠলাম, "তুমি যা বললে তা কখনই ঘটবে না।"

"কখনই না, কখনহ না।"



দিন গড়িয়ে গেল, তারপর মাস, বছর।

আমরা এখন বৃদ্ধ টিম, আগাথা আর আমি। আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের স্ত্রী স্বামীরাও কেউ আর পৃথিবীতে নেই। অদ্ভুতভাবে ঠিক আমরা তিনজনে আবার ফিরে এসেছি শৈশবেব স্মৃতি মাখা বাড়িটায়।

এখানেই সত্তর বছর আগে, বিশ্বাস করা কঠিন তবু সত্তর বছর আগে সেই দিনগুলো কাটিয়েছি। সেই পুরানো হলুদ হয়ে যাওয়া ওয়াল পেপার, আর আসবাবের মাঝে বসে আমরা একজনকে ডেকে পাঠিয়েছি।

ফায়ার প্লেসের নিভন্ত আগুনের সামনে বসে আমরা ডেকে চলেছি তিনজনে।

ঠাকুমা! তুমি বলেছিলে আবার ফিরে আসবে যখন তোমাকে আমাদের প্রয়োজন

হবে। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি আমাদের দিন ফুরিয়েছে, আমরা তোমাকে চাই, তোমাকে চাই।

এই পুরানো বাড়িটার তিনটে ঘরে তিন বৃদ্ধ শিশু তাদের হাতের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে কেঁদে ওঠে।

"আমরা তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আমরা তোমাকে ভালবাসি।"

ভোরের আকাশে এক দৃষ্টে চেয়ে আসায় বসে থাকি আমরা। সেই হেলিকপ্টারটা কি আবার আসবে?

"সেই সুন্দর মমিটা? কাঠের বাক্সে করে সেটাকে কি কেউ আবার আমাদের লনে এনে দিয়ে যাবে?"

আকাশের বুক চিরে অ্যাপোলো দেবের রথ কি আসবে না?

আগাথার গলায় ঝোলানো সেই সোনার প্রতীক্ষারত চাবিটা। ভগবান! এত বছর পরে সেটা কি আর কাজ করবে? সেটা কি, সেটা কি ঠিক লাগানো যাবে, আদৌ লাগবে ঠাকুমার শরীরে?

ভাষান্তর : মধুকুতা মুখোপাধ্যায়

মার্থা

ফ্রেড স্যাবারজেন

মঙ্গলবার মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই সাইন্স মিউজিয়ামে ভীড় খুব কম। আমি ডাইরেকটরের সঙ্গে তাঁর অফিস ঘরে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় দেখি এক দঙ্গল স্কুলের ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে নতুন প্রদর্শিত মডেল কম্পিউটারের সামনে। ওর নাম রাখা হয়েছে মার্থা। কতগুলো ইলেকট্রনিক শব্দের সংক্ষিপ্ত-করণ। মার্থা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন পরিসরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম এমনকি অজ্ঞ মানুষদের কাছে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও।

ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে কিছুক্ষণ পর জানালাম, আমার মনে হয় কম্পিউটার নিজেই নিজের ডিজাইন পাল্টে ফেলতে পারে।

ডাইরেকটর গর্বিত। হ্যাঁ, তাত্ত্বিক ভাবে তাই-ই। কিছু নিজের জন্য যুক্তির নতুন ডিজাইন সারকিট ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু পরিবর্তনে পেঁছতে পারেনি।

—আপনি কম্পিউটারকে মেয়ে বলে ধরেন কেন?

—আমার তাই ধারণা। কারণ কি জানেন সে এখনো রহস্যময়ী। এমনকি যে পুরুষ তাকে ভাল ভাবে জানে তার কাছেও। তিনি বিদ্রুপের হাসি হেসে সবার মুখের দিকে তাকালেন।

—কেন কি করে সে—কি বলে মানুষদের? বরং আমি এভাবে প্রশ্ন রাখি। সে —সাধারণত কি ধরনের প্রশ্ন পেয়ে থাকে?

—ওহ! সে সব মজার মজার বিষয়। ডাইরেকটর একটু থেমে নিলেন। মার্থা প্রত্যেককে একমিনিট করে সুযোগ দেয় তারপর তাকে বলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। সে তার যন্ত্রের কৌশলে মানুষের আকৃতি দেখে তার বিভাগ ঠিক করে নিতে পারে। সে একটার পর একটা প্রশ্ন একই সঙ্গে যথাক্রমে পরিচালনা করতে সক্ষম। সব চেয়ে মজার ব্যাপার সে যখন শিশুদের সঙ্গে কথা বলে তার ব্যবহৃত শব্দগুলো হয়

সহজ-সরল। ও আমাদের গর্ব।

আমি নোট তৈরি করছিলাম। সম্ভবত আমার সম্পাদক মার্থার ওপর একটা ভিন্ন রচনায় খুশি হবেন এবং অন্যটি সাধারণভাবে মিউজিয়াম নিয়ে। আপনার মতে যন্ত্রকে যে সব সাধারণ প্রশ্নগুলো করা হয় তা কি কি?

ডাইরেক্টর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলতে থাকলেন, দর্শকরা কখনো কখনো প্রশ্ন করে। তুমি কি ভেতরে একটি মেয়ে কথা বলছ? প্রথম প্রথম মার্থা সবসময় উত্তর দিত না। কিন্তু এরপর থেকে সে বলতে শুরু করেছে, আমাকে কি সেখানে দেখতে পাচ্ছো। এটা মোটেও কোন পরিকল্পনা মাফিক উত্তর নয় যা উল্লেখযোগ্য হতে পারে। সে একজন ছোট্ট মহিলা। তিনি আবার বিদ্রূপের হাসি হাসলেন, কখনো কখনো দর্শকরা তাদের ভাগ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে। নিশ্চয়ই ঐসব প্রশ্নের উত্তর মার্থার পক্ষে কোন মতেই দেয়া সম্ভব নয়। দাঁড়ান আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন। হ্যাঁ মনে পড়েছে, কেউ কেউ আবার বিরাট বিরাট সংখ্যা দিয়ে গুণ করাতে চায় অথবা বৈদ্যুতিক বোর্ডে খেলতে চায় টিক-ট্যাক-টো। সে এ সমস্তগুলো খুব ভালভাবেই করতে পারে অবশ্য। এবং ওর জন্য এখন মিউজিয়ামে দর্শক সমাগম অনেক বেশি।

আমি যখন ফিরে আসছি ততক্ষণে ছেলের দল সব চলে গেছে। এই মুহূর্তে এই ঘরে শুধু আমি আর মার্থা। যোগাযোগ করার ফোনগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় বিভিন্ন হাতল থেকে ঝুলছে। আমি একটু এগিয়ে একটা ফোন তুলে নিলাম। কিরকম বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

—বলুন মহাশয়, আমার কানে প্রবেশ করল? এক মেয়েলি কন্ঠস্বর, আমি জানি এটা তৈরি করা শব্দ, একক রেকর্ড তৈরি শব্দগুলো ইলেকট্রনিক দিয়ে একত্রিত। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

আমি প্রেরণা পেলাম, তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন কর, আমার অনুরোধ।

সেই সুন্দর শব্দগুলো আর একবার বেজে উঠলে, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

—তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন কর এটা আমি চাই, আমি আবার বললাম।

—তুমি প্রথম মানুষ যে তোমাকে প্রথম প্রশ্ন করতে বললে। এখন এটাই আমার প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করার। একজন মানুষ হিসেবে আমার কাছ থেকে তোমার কি প্রত্যাশা?

আমি কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে যাই। তারপর বললাম, আমি জানি না। ঠিক অন্যান্যদের মত। আমি মনে মনে কি করছিলাম কি করে আমার উত্তর আরো ভালো ভাবে দেখা যায়, সেই সময় আলো জ্বলে উঠলো, তাতে পরিস্কার লেখা ঃ

মেরামতের জন্য কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে যখন আমার নাক চূর্ণ করছি আমায় মাপ করবেন।

এই খেয়ালিপনাগুলো মোটেও মার্থার নয়; শুধুমাত্র মানুষের পরিকল্পিত লেখাগুলো কাচের ওপর ছাপানো। যদি সে এই মেরামতের আলো ঘুরিয়ে জ্বালিয়ে দেয়, তাহলে সে পৃথিবীকে শুধুমাত্র ঐ শব্দগুলো দেখাতে পারবে। এরমধ্যে দেখি আমার হাতে যে ফোনটি ছিল আর কাজ করছে না। যেই আমি চলতে শুরু করলাম আমার মনে হল মেঝের নিচের কলকব্জাগুলো আবার চলতে শুরু করলো।

এর পরদিন ডাইরেকটর আমাকে ডেকে বললেন, মার্থা নিজেই নিজেকে ভেঙে তৈরি করছিল। পরদিন আমি দেখতে যাই। প্রচণ্ড দর্শকের ভীড়। মানুষজন নতুন তৈরি করা প্যানেলর বোতাম পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে। এই বোতামগুলো টিপলে একেকটায় একেক রকম শব্দ হয় কিংবা কোনটায় রঙিন আলো অথবা মনের মত স্থিতিশীল বৈদ্যুতিক এই মিশ্র পদ্ধতিগুলো যন্ত্রের ওপরের অতিরিক্ত আকর্ষণ। প্রতিটি টেলিফোন রিসিভার থেকে দর্শকরা উত্তর পাচ্ছে মোলায়েম চটুল শব্দের বোকা বেকা উত্তর, লম্বা-লম্বা প্রযুক্তির শব্দ দিয়ে তৈরি।

ভাষান্তর ঃ সুতপা মল্লিক

আইভা

আনাতলি দনেপ্রভ

চলন্ত ট্রেনের সোফায় আরামে চোখ বুঁজে মৌজ করছি। নিরিবিলি কামরা, বিরক্ত করার কেউ নেই। সুপার লাইন এক্সপ্রেস চলছে দুরন্তবেগে, টিক্-টিক্-টিক্।
এমনি সময়ে স্লাইডিং দরজায় শব্দ হোল, ঠক্-ঠক্-ঠক্।
আরামের মৌজটা ভেঙ্গে গেল। বিরক্ত চোখে তাকালাম দরজার দিকে। আবার ভেসে এল শব্দ, ঠক্-ঠক।
রাতের বেলায় আবার কোন প্যাসেঞ্জার ঢুকবে ঘরে। ভাবতেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই, ট্রেন তো আমার কেনা সম্পত্তি নয়। বাধ্য হয়েই উঠলাম, দরজার ল্যাচ্টা খুলে দিলাম।
ট্রেন কন্ডাকটারের পেছনেই দাঁড়িয়ে আধপাগলা চেহারার ছ-ফুট লম্বা মানুষটা। মাথাভর্তি আধপাকা চুল। লোকটাকে দেকেই চড়া মেজাজ আরও চড়ে গেল।
আমার বিরক্তিভরা মুখটা দেখে ট্রেন-কনডাক্টার বলে উঠল,- স্যরি কমরেড, এই রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে। আপনার কামরায় শুধু একলা আপনি আছেন বলেই একে এখানে অ্যাকামোডেট করছি। অন্য কামরার হৈচৈ-এ উনি বড় অস্বস্তি বোধ করছিলেন।
—আই সি! নিরিবিলি আপনারও পছন্দ? বাঃ বেশ, আমিও তাই ভালভাসি। আসুন তবে। এতক্ষণে এই প্রথম খুশির হাসি ফুটল আমার মুখে।
স্লিপিং-স্যুট পরা এই রাতের আগন্তুক একঝলক তাকাল আমার দিকে, তারপর কথার প্রত্যুত্তর না করে আমার কূপেতে ঢুকে সিটে বসে পড়ল। তারপর টেবিলের ওপর কনুই-এ মাথা রেখে চোখ বুজল।

কণ্ডাকটার স্মিত হেসে বলল, —কমরেড এবার তো খুশী। বিশ্রাম করুন। আগন্তুককে নড্ করে চলে গেল।

স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে নিজের সিটে এসে বসলাম। প্রথম রাতের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ায় চট্ করে যে ঘুম আসবে না বুঝতেই পারছি। তাই সিগারেট ধরালাম, সিগারেট টানার ফাঁকে আগন্তুককে ভাল করে পরখ করতে লাগলাম।

চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ বয়স হবে মানুষটার। আধপাকা চুল, মুখে নানান চিন্তার ছাপ। বোঝাই যাচ্ছে নিরিবিলি বিশ্রামস্থল মানুষটার দরকার। সিগারেট টানা শেষ হলে শুয়ে পড়লাম বার্থে। কিন্তু ঘুম এল না। মাঝে মাঝে একটা কথা খোঁচা মারতে লাগল, মানুষটার কোনও বদমতলব নেইতো। চুরি-ডাকাতি তো লেগে থাকে এইসব রাতের গাড়ির নিরিবিলি কামরায়। ঘুমাতে গিয়েও তাই ঘুমাতে পারি না। শুয়ে শুয়েই তাকিয়ে থাকি আগন্তুক যেন রহস্যময় হয়ে উঠে আমার কাছে।

—ভয় নেই, চোর-ডাকাত নই। নিশ্চিন্তে ঘুমান। আগন্তুক স্থির গলায় আমাকে জানায়।

চমকে উঠি। এ কিরে বাবা! মনের কথা জানল কি করে আগন্তুক! এ কি তবে ভল্ফ মেসিন, মনের কথা ধরা পড়ার যন্ত্র!

ভাল করে আবার তাকালাম লোকটার দিকে। লোকটা বলে উঠল, —ঘাবড়াবেন না কমরেড, আমি, আপনারই মত খাঁটি মানুষ। আগের ট্রেনটা ফেল করেই এই বিপদে পড়েছি। নিরিবিলি কামরা একান্তই দরকার আমার।

কথা শুনে আগন্তুককে খুব খারাপ লোক মনে হচ্ছে না। তাই বললাম, —অসুবিধে হলে আলোটা নিভাতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।

—ধন্যবাদ। বলেই আগন্তুক উঠে এল, দরজার পাশেই সুইচ-পয়েণ্টে হাত ঠেকিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকার নেমে এল ঘরে। কিছুক্ষণ সময় পার হতে, অন্ধকারও হয়ে এল। আবছা ছায়ার মত বসে আছে আগন্তুক তার সীটে, মাথার পিছনে হাত, পা-দুটো সামনে আমার সীটের দিকে লম্বা করে ছড়ানো।

ঘুম আসছে না, তাই বাধ্য হয়েই আলাপ জমাতে চাই আগন্তুকের সঙ্গে।

—বেহিসেবী হয়ে ট্রেন ফেল করলেন কি করে? প্রশ্ন করি।

আমার কথায় চমকে তাকাল আগন্তুক। তারপর বলল, —আর বলবেন না, আইভার চিন্তাই আমায় ডোবাল। স্টেশনের বেঞ্চে ও বসে। আইভা যে ভুল সে কথাই ভাবছি, আর তারই ফাঁকে কখন ট্রেনটা এল আর গেল, বুঝতেই পারি নি।

—কোনও রকমে দায়সারা উত্তর দেয় আগন্তুক।

—আইভা! মানে আপনার স্ত্রীর কথা বলছেন নাকি? প্রশ্নটা না করে পারি না।

—স্ত্রী! এর মধ্যে মেয়েছেলের কথা উঠল কোত্থেকে? বলেই আগন্তুক হেলান শরীরটাকে সটান সোজা করে কড়া স্থির চোখে তাকাল আমার দিকে।

এবার আমিও রেগে উঠি। —এইতো বললেন, আইভা যে ভুল, সে কথাই ভাবছিলেন। আইভা যে স্ত্রীলোক, এ কথা তো বোঝাই যাচ্ছে।

—বাঃ, স্রেফ একটি শব্দ শুনেই বোঝা যায় যে শব্দটি স্ত্রীলোককে বোঝাচ্ছে? ধমক দিয়ে উঠে আগন্তুক। তবে আপনাকে দোষ দেব না মশাই। এই অদ্ভুত চিন্তা তার মাথাতেও ঢুকেছিল। সে ভেবেছিল, সে বুঝি সত্যিই একজন মহিলা। কেমন বাঁকা গলায় কথাটা বলে আগন্তুক।

মেজাজটা আমার চড়ে উঠলেও বুঝতে পারছিলাম আগন্তুক বেশ খ্যাপাটে ধরনের। তাই আলাপ জমাবার জন্য নরম গলায় বললাম, —দেখুন, রাগ করবেন না, ভদ্র-মহিলাকে কেউ 'সে ভেবেছিল,' 'সে বুঝি'। এই জাতীয় কথায় বোঝায় না। আমি লেখক বলেই কথাগুলো আমার কানে ভাল লাগছে না।

সহযাত্রী এই প্রথম কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। শেষে বলল, —এই জাতীয় শব্দ এক দশক আগে চলত, এখন আর চলে না। সর্বনাম ব্যবহার করা মানে আমাদের অভ্যস্ত কোডের সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করা। আর সেই সঙ্কেত কোড ব্যবহার করে আমরা লিঙ্গ-বিষয়ক চেতনাকে উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করি। কিন্তু অচেতন বস্তুর কোনও লিঙ্গ নেই। অবশ্য ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি শব্দে এর ব্যতিক্রম আছে। আমার আইভা লিঙ্গ-চেতনার উর্দ্ধে।

লোকটা ভাষাবিদ নাকি? বুঝে উঠতে পারছি না। পরখই করি না? তাই বললাম, —রুশ ভাষার তুলনায় ইংরেজী ভাষা বেশ সরল। তা বলে—

—বাঃ, ভালই উদাহরণ দিয়েছেন। এই হচ্ছে কোড-ব্যবস্থার তফাত। নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত সঙ্কেত প্রণালীই হোল কোড। আর শব্দ হচ্ছে সংকেত। এই সংকেত যার যত সরল, তার কোড-ব্যবস্থাও তত সহজ হবে।

মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যায়। কোড, সংকেত, এসব কি বলে সহযাত্রী মানুষটা। বলতে বাধ্য হই, —মশাই। কোড-ফোড্, কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

—বেশ, সহজ করে বোঝাই কথাটা। ধরুন 'ওয়াগান', এই শব্দটা ব্যবহার করলাম, তাতে কি হল। একটা ওয়াগানকে বোঝাল। কিন্তু যেই বললাম, 'ওয়াগানগুলো,' তখন, 'গুলো' এই শব্দ যোগ করে অনেকগুলো. ওয়াগান বোঝালাম। তাহলে দাঁড়ালোটা কি, 'গুলো' হচ্ছে সংকেত, যা দিয়ে বস্তুর সম্বন্ধে এক চেতনা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। মডুলেটেড্ হচ্ছে।

—আঃ মশাই, আপনি কোড্, সংকেত মডুলেশন এইসব কথা বারবার ব্যবহার করছেন কেন বলুন তো? আমাদের ব্যাকরণের পরিভাষায় এসব বোঝাবার অনেক সহজ নিয়ম আছে। চমকে উঠি আমি।

—ব্যাপারটা পরিভাষা নিয়ে নয় মশাই এ হচ্ছে আরও গভীরতর ব্যাপার। ভেবে দেখুন না আমাদের রুশ ভাষার ৩৫টি অক্ষর দিয়ে না হোক প্রায় এক লক্ষ মূল শব্দ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি শব্দে যদি গড়ে থাকে পাঁচটা অক্ষরে, তাহলে

সাধারণ মানুষকে এই পাঁচলক্ষ অক্ষরের বিন্যাসকে মাথায় রাখতে হবে। এরপর আছে ব্যাকরণের কচকচানি, বিভক্তি, কারক রূপের নানান খেলা। ভাবুন তো, মানুষের মগজ কতটা এর জন্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

—এ ছাড়া পথটাই বা কি? ভাষা বলতে গেলে ব্যাকরণকে তো মনে রাখতেই হবে। —আমি বলে উঠি।

—নাঃ মশাই, এর চেয়ে সহজ পথও আছে। সেখানে ৩৫টা অক্ষরের বর্ণমালা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। ধরুন, ১ থেকে ১০, এই দশটি সংখ্যাকে ক্রমান্বয়ে, মিতব্যয়ে কাজে লাগালে চল্লিশ লক্ষ বিন্যাস সম্ভব হবে। এরই মধ্যে আবার ১ থেকে ১০-এর মধ্যে দশটি সংখ্যা ব্যবহার না করে, স্রেফ ১ আর শূন্য, এই দুই সংখ্যা দিয়েই কাজ করা যাবে।

কথাটা শুনে হেসে ফেলি আমি।

—অর্থাৎ আমাদের মত লেখকরা যদি কবিতা লিখি, তখন স্রেফ এভাবেই লিখব বলছেন,—

এক, এক,
শূন্য-শূন্য, শূন্য-শূন্য।
এক, শূন্য-শূন্য, এক, এক।
এক, এক, এক, শূন্য-শূন্য।
শূন্য-শূন্য, শূন্য-শূন্য, শূন্য-শূন্য,
এক।

বলেই হাঃ, হাঃ করে হেসে উঠি। দেখলাম সহযাত্রী বেশ চটে উঠেছেন।

বলছেন, কথায় তো মনে হচ্ছে বেশ কিছু বিদেশী ভাষা জানেন। তাহলে দেখুন ইংরেজীতে হাতিকে কি বলে?

—কেন Elephant। নির্দ্বিধায় বলি।

—আট অক্ষরের শব্দ নয় কি?

—হ্যাঁ।

—আর আমাদের রাশিয়ান ভাষায় তাকেই বলি স্লান (CπOH), চার অক্ষরের শব্দ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। তবুও দেখুন মশাই হাতিকে বোঝাতে অসুবিধে হচ্ছে কি আমাদের দু-দেশের মানুষের?

—নাঃ, তা হচ্ছি না।

—আবার দেখুন ইংরেজীতে ট্রাম হচ্ছে চার অক্ষরের শব্দ। আর রাশিয়ান ভাষায় সেটাই হচ্ছে ত্রাম্‌ভার (Tpambah), অর্থাৎ তিনটি বর্ণ বেশি। তবুও দেখুন এগুলো যে ট্রামকেই বোঝাচ্ছে, সেটুকু বুঝতেই পারছি। নয় কি?

—তাতো বটেই। আম্‌তো আম্‌তো করে বলি।

—বুঝছেন তাহলে, শব্দ আসল কথা নয়, আসল কথা আমাদের চেতনায় ঐসব শব্দ

কি ভাব মূর্তি, বা, অনুভূতি ফোটাচ্ছে, সেটাই মূল কথা। এইজন্যই তো পাভলভ্ বলেছেন, মানুষের মধ্যে আছে এক দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থা যা দিয়ে জটিলতম অনুভূতিও বোঝান যায়। বহির্জগতের নানান বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে কোড্ তা হল শব্দ। এই কোড্ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বহির্বস্তুর অনুভূতি সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা বুঝলেন ?

—মনে হচ্ছে আবছা আবছা কিছুটা বুঝছি।

—আরও সহজ করে বলি। ধরুন গরম ইস্ত্রিটাতে হাত লাগল, ছ্যাঁক করে। উঃ গরম বলে হাতটা সরিয়ে নিলেন। একেই আমরা বলছি রিফ্লেক্স অ্যাকশন। এরপর ধরুন আপনি ইস্ত্রিটা ছুঁতে যাচ্ছেন, তক্ষুনি কেউ যদি চেঁচিয়ে ওঠে, "উঃ, গরম", তাহলে কি করবেন ?

—হাতটা চট করে সরিয়ে নেব।

—ঠিক। "গরম" এই কথাটা হবে কোড, গরমের অনুভূতি বোঝাবার জন্য। এখন "গরম" কথাটার বদলে স্রেফ যদি 'শূন্য' কোড্ ব্যবহার করি, আর তাতেই যদি অভ্যস্থ হয়ে যান, হলে "শূন্য" বলে চেঁচিয়ে উঠলেও কি গরম ভেবে হাত সরাবেন না ?

—তা সরাব। আম্তা আম্তা করে বলি।

সেইজন্যই বলছি, পৃথিবীর সবকিছুকে আমরা চিনি, বুঝি উপলব্ধি করি। আমাদের সবকিছু বোধ ইন্দ্রিয় দিয়ে। এই অনুভূতি চিন্তা, গতি-প্রকৃতি পাঠাচ্ছে আমাদের স্নায়ুতে নানান সংকেত। এই সংকেত স্নায়ুপ্রান্ত থেকে প্রবাহিত হচ্ছে স্নায়ুব্যবস্থার মূলকেন্দ্র মস্তিষ্কে। এখন দেখুন, স্নায়ু থেকে মস্তিষ্কে পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতগুলো কেমন করে পৌছায় জানেন ?

ক্রমেই যেন বোকা বনে যাচ্ছি আমি। আগন্তুককে ভাষাবিদ্ ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তাই অবাক গলায় বলি, —না মশাই, জানি না।

—স্রেফ কোডবন্ধরূপে। আর সেই কোড্ শুধু শূন্য আর একের নানান্ সমষ্টি।

—স্রেফ্ বাজে কথা। না চেঁচিয়ে পারি না। অন্ধকার কূপেতে তখন থেকে অনেক আবোল-তাবোল বকছেন সহযাত্রী মানুষটি। নাঃ আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়। উঠে কূপের লাইটটা জ্বালিয়ে দিই। বাতির আলোয় ঘর ভরে যায়।

—ওঃ, ভাবছেন পাগল আমি, নাঃ। চুপ করে বসুন, আর কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। প্রায় ধমকেই সিটে বসিয়ে দেয় আমায়।

আগন্তুক এবার বলে—দিনতো একটা সিগারেট, বহুক্ষণ বকিয়েছেন। ভেবেছিলাম সিগারেট ছেড়েই দেব, শুধু আপনার জন্যই হল না দেখছি। বলেই হাতটা বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে।

সুবোধ বালকের মত সিগারেট এগিয়ে দিই। ফুঃ ফুঃ, করে কয়েকবার জোরে টান দিয়ে নেয় আগন্তুক সিগারেটে, তারপর বলে, —বুঝলেন, যা বলছিলাম, এসব

কম্প্যুটারের কথা। এই যন্ত্র সংখ্যা, বা রাশি নিয়ে কাজ করে না, কাজ করে রাশির কোড সংকেত নিয়ে। কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য এলে, তাকে শূন্য আর একের মধ্য দিয়ে যন্ত্রে কোডবন্ধ করা হয়, আর তারপর বিদ্যুৎ —প্রেরণার রূপ নেয়। মনে রাখবেন, এক দিয়ে বোঝান হয় এই "প্রেরণার অস্তিত্বকে"। বুঝলেন তো শূন্য আর এক কেন লাগানো হয় ?

—শব্দের সঙ্গে শূন্য আর একের সম্পর্ক এখনও পরিষ্কার হয়নি। দ্বিধা না করেই বলি।

—আচ্ছা, আরও সহজ করে বলি। ধরুন, যন্ত্রকে বলছি অঙ্ক কষ। যন্ত্রকে প্রথমে বোঝান হল কোন প্রক্রিয়া-চক্রে অঙ্কটা কষতে হবে। তারপর বলা হয়, "প্রথম সংখ্যা দুটো যোগ করে যোগফল মনে রাখ। তারপরের দুটো সংখ্যাকে গুণ করে তার ফল মনে রাখ। তারপর হয়ত বলা হল, প্রথম ফলকে ভাগ কর দ্বিতীয় ফল দিয়ে।"

—যন্ত্রকে বলা হল, এ আবার কি কথা ? যন্ত্র কি মানুষের কথা বোঝে ? অবাক্ হয়ে বলি।

—হ্যাঁ বোঝে। যন্ত্রকে সেভাবেই তৈরি করা হয়। বিভিন্ন কাজের প্রক্রিয়া-চক্র যন্ত্রকে শিখিয়ে দিলে যন্ত্র তাকে অনুসরণ করতে পারে। অনুসরণ পদ্ধতিকেই আমরা বলি যন্ত্রের কথা বোঝা। আর একটা কাজের ফল যন্ত্র রেখে দেয় তার স্মৃতিতে, বা মেমারি বক্সে।

—হুঁ, বলুন তারপর। বলে উঠি। বেশ মজা পাচ্ছি কথাগুলোর মধ্যে যদিও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না সবকিছুতে।

—যন্ত্রকে কর্মসূচী দেওয়া হোল কোডবন্ধ প্রেরণারূপে। যে মুহূর্তে একগুচ্ছ রাশি যুক্ত করছি, সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক কোড জানিয়ে দিচ্ছে, সেই রাশি কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করবে। ফলে কর্মসূচী ও ফলাফল তৈরির ঝঞ্ঝাট থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

—তাই বলুন মশাই, এসব তো স্রেফ কম্প্যুটারের কথা। কম্প্যুটার তো আর অজানা নয় আমাদের। প্রায় হেসেই ফেলি কথাটা বলতে গিয়ে।

—না অজানা নয়। শুধু এটাই অজানা এই যন্ত্র জানে না সমস্যাটা কি, আর কি পদ্ধতিতে তাকে সমাধান করতে হবে। যন্ত্রকে জানাতে হবে প্রব্লেমকে, কোন্ পদ্ধতিতে তাকে এগুতে হবে। এ দুটো আজও মানুষই করে দিচ্ছে। তাই যন্ত্র যন্ত্রই থেকে গেছে, ঠিক মানুষের মস্তিষ্ক হয়ে ওঠেনি।

—এতো জানা কথা। এর মধ্যে নূতনত্ব কি দেখলেন, যন্ত্র কি আর মানুষ হোতে পারে ?

—ঠিকই, একদিন আপনার মতই একথা ভাবতাম। যন্ত্র মানুষের তৈরি, মানুষেরই আজ্ঞাবহ তাই মানুষের মস্তিষ্কের স্থান অধিকার করা অসম্ভব। জটিল বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা এসব যন্ত্রের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু দেখুন মশাই, ইলেকট্রনিক

যন্ত্র আজ কতটা এগিয়ে গেছে। আগে যেখানে যন্ত্রের ওজন ছিল কয়েকশ টন, আজ সেখানে ওজন কত হাল্কা হয়ে গেছে। এমনকি বিগত ১৯৫৫ সালে আমাদের এই রাশিয়ায় আর আমেরিকাতে যে যন্ত্র বার হয়েছিল তা গণিত বিষয়ক-তথ্যাদিকে রুশ থেকে ইংরেজী আর ইংরেজী থেকে রুশে অনুবাদ করতে পারত স্বয়ংক্রিয়ভাবে। মনে আছে আপনার সে-কথা ?

আমাকে বলতেই হয়,—হ্যাঁ, কথাটা মনে আছে, কারণ সেই সময়ে কথাটা বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

—যন্ত্রের দ্রুত প্রগতি হচ্ছে দেখে আমিও যন্ত্র নিয়ে মেতে উঠলাম। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল গণিত বহির্ভূত সমস্যা সমাধান কতটা বেশি করানো যায় এই যন্ত্র দিয়ে। এইরকম যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে শেষে বার করেছিলাম এমন যন্ত্র, যা রুশ ভাষায় কোনও বইকে ইংরেজী, জার্মানী, ফরাসী আর চীনে ভাষায় সহজেই অনুবাদ করতে পারে। বিশেষ ধরনের টাইপযুক্ত এই যন্ত্রে রুশ-শব্দ টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদের কাজ শেষ হয়ে যেত মুহূর্তে। অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত কোড যন্ত্র আপনা থেকেই বেছেবুছে ঠিক করে নেয়। যন্ত্র বেশ সাড়া জাগাল বিজ্ঞানী মহলে।

—তাহলে তো আপনি সাংঘাতিক কারবার করেছিলেন মশাই! আশ্চর্য গলায় বলি।

—না মশাই, আমি কিন্তু যন্ত্রটার কাজে তখনও খুশী হই নি। অনুবাদক যন্ত্রকে নিখুঁততর করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। সব অনুবাদ শব্দ সঠিক মনে হচ্ছিল না আমার তাই এই খুঁতখুঁতানি ছিল আমার মনে। অসুস্থ হয়ে তিনমাস শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম। মাথায় শুরু হোল যন্ত্রণা।

—অত্যধিক খাটাখাটুনিতে এরকম যন্ত্রণা হয়ই মাথায়। ব্যাপারটাকে সহজ করতে চাই আমি।

—নাঃ, তা নয় মশাই। আসলে, বিগত যুদ্ধে, রাডার কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল আমার। সেই সময়েই জার্মান আক্রমণের সময় বিমান আক্রমনের ফলে মাথায় ভীষণ চোট লাগে। এরপর, ভাল হয়ে গেলেও, নানান কারণে, মাঝে মাঝেই মাথায় যন্ত্রণা হোত। এইবার যখন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জন্য বিশেষ ধরনের চুম্বক-ব্রেন নিয়ে চলছিল কাজ, তখন আমার মস্তিষ্ক কোথেও বিশেষ ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। উল্টোপাল্টা ব্যবহার শুরু করলাম আমি।

- সে কী! চুম্বক-ব্রেন তৈরি করতে গিয়ে আপনার ব্রেনই বেকায়দায় পড়ল।

—হ্যাঁ কমরেড, তাইই। এরপর পরিচিত লোককে সামনে দেখলেও তার নাম মনে পড়ত না। জানা জিনিসপত্র দেখলেও তার নাম কিছুতেই মনে আসত না। এমনকি ল্যাবোরেটরীতে কাজ করতো অ্যাসিসটেন্ট তার নামও মনে পড়ত না। শেষে একদিন কাজ করতে করতে ল্যাবোরেটরিতে চেঁচিয়ে উঠলাম, —কলম, কলম নিয়ে এস।

ল্যাবোটরিতে মেয়েটি কলম নিয়ে আসতেই রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম,— এ কলম নয়,

অন্য কলম।

—বেচারা আমার হাবভাব দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আবার একজন ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে নিয়ে এল।

বলল—দেখুন না, ইয়েভগেনি সিদোরভিচ্ কেমন আজেবাজে কথা বলছেন।

ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্টেণ্ট যে এতদিন আমার সঙ্গে কাজ করেছে তার নামও মনে পড়ল না আমার। আমার অবস্থা দেখে সেই ইঞ্জিনিয়ার তক্ষুনি ডেকে নিয়ে এল ডাক্তারকে আর আমায় দুই তরুণ ল্যাবোরেটরি অ্যাসিস্টেণ্টকে। তারপর আমাকে আবার চালান করল হাসপাতালে।

হাসপাতালে এসে আলাপ হল ভিক্টর ভাসিলিয়েভিচ্ জালেস্‌স্কির সঙ্গে। হাসপাতালের পয়লা নম্বর নিউরোপ্যাথোলজিস্ট। এই নিউরোপ্যাথোলজিস্টই আমার গবেষণার জগতকে নতুন দিকে নিয়ে গেল।

—কমরেড ইয়েভগেনি, আপনার কাহিনী ক্রমেই ইনটারেস্টিং হচ্ছে দেখছি। কথাটা না বলে পারি না।

—আহ! কাহিনীতো শুরুই হয়নি। এতক্ষণ যা বললাম এতো ভূমিকামাত্র।

—তাই নাকি! অবাক হবার পালা আমার।

—হ্যাঁ। ভিক্টর ভাসিলিয়েভিচ্ আমায় পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। আপনার ওষুধ হচ্ছে স্রেফ বিশ্রাম। সকাল বিকেলে বেড়ান, ঠাণ্ডা জলে চান করুন। আর ল্যুমিন্যাল পালডার দিচ্ছি, এটা খেয়ে ঘুমাবেন, ভাল ঘুম হবে। এগুলো করলেই আপনার ভেঙ্গেপড়া নার্ভব্যবস্থায় যোগাযোগ লাইন ঠিক হয়ে যাবে, আপনি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

সেদিন কথাটা শুনে অবাক্ হই। নার্ভব্যবস্থায় যোগাযোগ লাইন এ আবার কি! আমার হতচকিত ভাব দেখে নিউরোপ্যাথোলজিস্ট বলেন, হ্যাঁ কমরেড, নার্ভব্যবস্থা হচ্ছে খুব জটিল রেডিও সার্কিটের মত। আর আপনার ক্ষেত্রে, সেই সার্কিটের কয়েকটা কনডাক্টর খারাপ হওয়ায় নার্ভযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করেছে।

সেদিনই নতুন চিন্তা পেয়ে বসল আমায়। ল্যুমিন্যাল পাউডার খেয়েও ঘুম এল না রাতে। পরের দিনই ঐ ডাক্তারকে বলি, দয়া করে মানুষের নার্ভব্যবস্থা সংক্রান্ত কিছু বই দিন। পাভলভের লেখা বইটা "মস্তিষ্কের অর্ধগোলকের ক্রিয়াকলাপ" পড়ে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠি। সেই প্রথম মাথায় এল, মানুষের নার্ভ-সার্কিটের মত সার্কিট-ব্যবস্থা তৈরি করলে তবেই নিখুঁত ইলেকট্রনিক-যন্ত্র তৈরি হবে। আর সেই যন্ত্র আমার এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত রোবট হয়ে উঠবে।

বইপড়ে সেই প্রথম বুঝলাম, মানুষের স্মৃতি, পারিপার্শ্বিক সবকিছুর সংস্পর্শে এসে প্রাণন ক্রিয়ার ফলে, যে সংবেদনতা লাভ করে তা এক-এক গুচ্ছ কোডরূপে মস্তিষ্কে জমা থাকে। এই এক-এক গুচ্ছ কোডকে বলে নিউরোন। মস্তিষ্কে এইভাবে কোটি কোটি নিউরোন কোডবন্ধ থাকে। প্রকৃতির সবকিছুর সঙ্গে সংস্পর্শে এসে, প্রকৃতির

বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ করে, নানান দৈনিক অভিজ্ঞতায় সৃষ্টি হয় অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গই প্রকৃতিকে অনুকরণ করার কাজ করায়। এমনি ভাবেই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কথা বা মূর্তি হয়ে, স্মৃতির বিভিন্ন ক্ষুদ্রক্ষুদ্র প্রকোষ্ট, কোডরূপে মুদ্রিত হয়ে অঙ্কিত থাকে।

সেই প্রথম বাইওফিজিসিস্টের বই পড়ে বুঝলাম অসিলোগ্রাফের সাহায্যে কি করে বিদ্যুত প্রেরণাকে দৃষ্টিগোচর করা যায়। চোখের ওপর জোরালো আলো ফেলে দেখা গেল অসিলোগ্রাফে বিদ্যুতপ্রেরণা দ্রুত-পরম্পরায় ফুটে উঠছে ঠিক সংখ্যা ও শব্দ ইলেকট্রনিক যন্ত্রে যেভাবে কোডবদ্ধ হয় সেইভাবেই। মস্তিষ্কের নিউরোনে এক ও শূন্যের দ্রুত পরম্পরা সমন্বয় বহির্বিশ্বের সংকেতকে ধরে রাখছে এক বিদ্যুৎ প্রেরণার মত।

ওইসব বই পড়ে এটা সেদিন বুঝলাম, মানুষের নার্ভব্যবস্থার সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের অনেক মিল থাকলেও প্রধান তফাত, মানুষের নার্ভব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্ধিত, পরিশুদ্ধ হয়, জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়। মানুষের স্পর্শ, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, মস্তিষ্ককোষে সংবেদন, বোধ-অনুভূতি—এইসব কিছু মস্তিষ্ককোষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুদ্রিত হয়ে, মানুষের মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। কিন্তু যন্ত্রে তা সম্ভব নয়। যন্ত্রে স্বয়ংভাবে কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না, কারণ যন্ত্রের না আছে অনুভব শক্তি, না আছে অসীম কর্মক্ষমতা। ফলে যন্ত্রের স্মৃতিভাণ্ডার নির্দিষ্ট, সেখানে আপনা-আপনি নতুনতর তথ্যে কিছু পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। যন্ত্র ও মানুষে এখানেই বিরাট ফারাক—

এরপরই নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হল আমার। ভাবতে লাগলাম, স্বয়ংবিকশিত স্বয়ং নিখুঁত কোনও যন্ত্র কি তৈরি করা যায় না? এমন যন্ত্র কি সৃষ্টি করা যায় না, যা মানুষের সাহায্য না নিয়েই নিজ স্মৃতিভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে? এমন যন্ত্র কি তৈরি হয় না যা নিজেই জ্ঞান আহরণ করে। যুক্তি-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজের কার্যধারা অদল-বদল করতে পারে। মানুষের সাহায্য সে যন্ত্রের লাগবেই না? এইসব চিন্তা পেয়ে বসল আমায়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। শুরু হোল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। একই চিন্তা তখন মাথায়, ইলেকট্রনিক ভাবুক যন্ত্র বানাতেই হবে, যে ভাবেই হোক।

আমার শরীরের কথা ভেবে, আর নিউরোপ্যাথলজিস্ট ভাসিলিয়েভের সার্টিফিকেটের জন্য ইনস্টিটিউটের কাজ থেকে আমি রিটায়ার করলাম। পেনসন ধার্য হোল। ইলেকট্রনিক ভাবুক যন্ত্র নিয়ে দিনরাত কাজ করার সুযোগ পেলাম।

এবার, ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ভালবের জায়গায় বসালাম ট্রানজিস্টর, ফলে আগের একটা ভালবের জায়গায় একশটা জের্মানিয়ম আর সিলিকন ক্রিস্টল বানানো গেল। যন্ত্রে চৌম্বক-স্মৃতি তৈরি করলাম এমনভাবে যাতে তিন হাজার কোটি কোড সংকেত ধরে রাখা যায়। এক মিটার ব্যাসের কাচের গোলকের ভিতরে জোরিক অক্সাইডের

পোটিং দিয়ে এমনভাবে ম্যাগনেটিক ব্যবস্থা রাখলাম যাতে প্রতি বর্গ মাইক্রনে পঞ্চাশটা বিদ্যুৎ-প্রেরণা মুদ্রিত করা যায়। এভাবে নতুন যন্ত্রকে, মানুষের স্মৃতি-ভান্ডারের অনেকটা সমকক্ষ করে তুললাম।

নতুন যন্ত্রকে শুনতে-বলতে-পড়তে লিখতে শেখাবার জন্য ব্যবস্থা নিলাম। জার্মান বিজ্ঞানী হেল্মহোলৎসের মতবাদটা কাজে লাগালাম। মানুষের কণ্ঠস্বর স্রেফ কিছু ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সির সুনির্দিষ্ট সংযোগ। হেল্মহোলৎস এগুলোকে নাম দেন "ফর্মাণ্ট"। যেমন যদি উচ্চারণ করি কথা "ও" আর সে উচ্চারণ ছোট বড় ছেলে মেয়ে যেই করুক না কেন তার ফ্রিকোয়েন্সি হবে একই। তাই ফ্রিকোয়েন্সিকে কাজে লাগিয়ে শব্দ সংকেতের কোডগুলোকে রোবটে বসালাম।

টেলিভিশন টিউবের সাহায্যে পড়তে শেখাবার কাজটা তৈরি করলাম। যন্ত্রের দুটোর মধ্যে একটা চোখ হোল ক্যামেরার লেন্স, যা টেলিভিশন টিউবের সেন্সিটিভ স্ক্রীনে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তুকে প্রজেক্ট করত। তারপর ইলেকট্রনিক রশ্মি সেই পাঠ্যবস্তুর ছবিকে অনুধাবন করে, প্রতি অক্ষর চিহ্নের জন্য সৃষ্টি করল নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ-প্রেরণার কোড।

লিখতে শেখানো হোল প্রচলিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের পদ্ধতিতে। শব্দ জেনারেটর তৈরি করলাম। বিদ্যুৎ-প্রেরণার জেনারেটর কাজ করত।

এইবার ভাবুক যন্ত্রের নাম দিলাম—'আইভা'। কেন জানি কিছুদিন ধরে এই নামটাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তাই। নামটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নারীকন্ঠে টিউন বেছে শব্দ-জেনারেটরের সঙ্গে সংযোগ করলাম। ভাববেন না, নারীকণ্ঠ বাছলাম এই জন্য যে নিঃসঙ্গ ব্যাচেলার মানুষ, নারীসঙ্গ পাব। তা নয়। মহিলা কণ্ঠের স্বর বিশেষ শুদ্ধ তাই সহজেই তাকে মূল ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাঙ্গা যায়।

এমনি ভাবেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অঙ্গযুক্ত হোল আইভার যান্ত্রিক শরীরে। আইভাকে প্রথমে শেখাতে শুরু করলাম এইভাবে,—"বল-মা"। "বল". কথাটা মাইক্রোফোনযোগে বাহিত হল। তৈরি করল কোড সংকেত, চালিত হল শব্দ-জেনারেটর। বিদ্যুৎ প্রেরণা তারসংযোগে আইভার স্মৃতিতে সাড়া জাগাল, সেখানে শব্দ মুদ্রিত হয়ে ফিরে এল শব্দ-জেনারেটরে। আইভা পুনরাবৃত্তি করল শুধু —"মা"। এমনি ভাবেই একে একে বন্ধ কথার কোড জমা হোল আইভার স্মৃতিতে। আইভা ক্রমেই শ্রুতিধর হয়ে উঠতে লাগল, কারণ, স্মৃতি-চৌম্বক দিয়ে গড়া স্মৃতি-ভাণ্ডারে একবার যা জমা হয়, তা আজীবন সঞ্চিতই থাকে। ক্রমে এমনটি হোল, আইভার আই-লেন্সের সামনে বই ধরলে সে পড়তে পারত। বই-এর ছবিটির প্রেরণা মুদ্রিত হয়ে যেত স্মৃতিতে, সেখান থেকে শব্দ-জেনাটেরে, শেষে শব্দের আকারে যথার্থ টিউনিংএ, আইভার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল মিষ্টি। উচ্চারণ স্পষ্ট। কিন্তু স্বর ভাবময় হয়ে ওঠেনি তখনও।

আইভাকে জোড়বার সময় তার মধ্যে বহু হাজার বাড়তি সার্কিট রেখেছিলাম এই

ভেবে, যন্ত্রটি সত্যিই যদি ভাবুক হয়ে ওঠে, তাহলে এই বাড়তি সার্কিটগুলো কাজে লাগবে। আর বলতে কি, ধীরে ধীরে আইভা ভাবুক আত্মনিখুঁত ইলেকট্রনিক রোবট হয়ে উঠল। অপরিচিত শব্দ, বস্তুকে দেখলে শুধু সেটুকুকেই স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত করত আপনা থেকেই। স্মৃতি-গোলকের চৌম্বক দণ্ডগুলো শুধু অপরিচিত শব্দবস্তুর ছবিকেই ধরে নিয়ে সঞ্চিত করতে স্মৃতিভাণ্ডারে। ফলে আইভার স্মৃতিভাণ্ডারের পরিধি বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আইভা তার কার্যধারাও বাড়িয়ে তুলল স্বয়ংভাবেই। ফলে, আইভা ক্রমেই আমার একান্ত সঙ্গী হয়ে উঠল নানান্ কাজের।



আইভা সবসময়েই আমার পাশে পাশে থাকে। আমার রিসার্চ-ওয়ার্কে বেশ কিছু সাহায্যও করে। একদিন একটা সমীকরণ সবে শেষ করেছি। আইভা সমীকরণের কাগজের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—উহুঁ। ওভাবে নয়। এটা যুক্তিসম্মত হল না। আমি রেগে তাকালাম আইভার দিকে। বলে উঠলাম,—সব কিছুর মধ্যে মাথা গলিয়ো না আইভা।

আইভা মুহূর্তে বলে উঠল,—আপনিও বাজে কথা বলবেন না।

প্রচণ্ড রেগে বলে উঠলাম,—ভদ্রসমাজে কিভাবে কথা বলতে হয় এতদিনেও শিখলে না। অভদ্র কোথাকার!

—আর, আপনি? অচেনা ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও জানেন না! তাই অচেনাকে বলে চলেছেন 'তুমি তুমি' করে!

—মহিলা! তুমি মহিলা, কে বলল? —অবাক্ হয়েই কথাটা বলি।

—আমি আইভা। মেয়েলী গলা আমার। গলার স্পন্দন ৩০০ থেকে ২০০০ সেকেণ্ড। আমি অচেনা আপনার কাছে, কারণ আমাদের পরিচয়ই কেউ করিয়ে দেয় নি।

হেসে ফেললাম। বললাম, —আইভা, আপনি কি ভাবছেন গলার সুরই নারী বোঝার একমাত্র লক্ষণ? ভদ্রতা দেখিয়েই কথাটা উচ্চারণ করলাম।

—হয়ত অন্য লক্ষণও আছে, তবে তা আমার বোধগম্য নয়। দ্রুত উত্তর দেয় আইভা।

বোধগম্য! কথাটা শুনে অবাক্ হই আবার। বলি, —বোধগম্য নয় বলে কি বলতে চাইছেন?

—আমার স্মৃতিভাণ্ডারে যা আছে তাই আমার বোধগম্য। আর তার বাইরের সবকিছু আমার বোধগম্য নয়।
এই প্রথম আইভাকে স্রেফ যন্ত্র বলে মানতে রাজী হলাম না। বুঝলাম, কিছু স্বাভাবিক ক্রিয়া ওর মধ্যে গড়ে উঠছে। ভাবলাম, আইভাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে দেখি আর কিছুদিন।
একদিন ওর স্মৃতিভাণ্ডার কতটা জোরদার হল পরীক্ষা করার জন্য বললাম,—বলুনতো আইভা, নতুন ধরনের রৌপ্য ও পারদ ব্যাটারী সম্পর্কে কি জানেন?
আইভা উচ্চারণ করল, —হা, হা, হা, মশাই মগজে কি ফুটো আছে নাকি? এর উত্তরতো গতকালই দিলাম একবার, আজই সব ভুলে খেয়েছেন?
আইভার কথায় রেগে উঠে ওকে গালাগাল দিই। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় আইভা, —মশাই, ভুলে যাবেন না, মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।
আমি ধমক দিই এবার। —আইভা! বাজে কথা বন্ধ না করলে আপনার ইলেকট্রিকেল কানেকশন খুলে দিতে বাধ্য হব।
—তা করবেন বৈকি। অসহায় আমি, আত্মরক্ষার শক্তি নেই, তাই তো যা খুশি তাই করছেন।
রাগে সত্যিই কানেকশন খুলে দিলাম। আইভা নিশ্চুপ হয়ে থাকল, পরের দিন সকাল পর্যন্ত। সারারাত ধরে শুধু এই ভাবনাই চলল মাথায়। এইসব শব্দ পেল কোথা থেকে আইভা? কি প্রক্রিয়ায় এভাবে আত্মবিকাশের সূচনা হোল আইভার সার্কিটে? নতুন কোনও সার্কিট আপনা থেকেই তৈরি হোল নাকি ওর ব্রেন-সেণ্টারে?
পরের দিন সত্যিই দুঃখ হোল আইভার জন্য। কানেকশন চালু করলাম। বললাম, —কি, রাগ করেছেন আইভা?
—রাগ করা অন্যায়? বলে ওঠে আইভা।
—আপনি অভদ্র কথা বলেওতো আমায় চটালেন। অথচ এটা কি জানেন, আমিই আপনাকে সৃষ্টি করেছি?
—স্রষ্টা বলেই কি যা ইচ্ছে তাই করবেন? আইভা বলে উঠে। আপনার মেয়ে থাকলে তার সঙ্গেও কি এভাবেই অভদ্রতা করতেন?
—আহ্ আইভা, আপনি স্রেফ যন্ত্র, আমাদের মত মানুষ নন, একথাটা বুঝছেন না কেন?
—আর আপনিও কি যন্ত্র নয়? আমি ধাতুতে তৈরি, আপনি জৈবিক পদার্থে তৈরি, ওটুকুই তো তফাত। তা না হলে, স্মৃতিভাণ্ডার, যোগাযোগ লাইন, সংকেত কোডবন্ধ করার নিয়মকানুন আপনার আর আমার ক্ষেত্রে একই নয় কি?
—আবার আজেবাজে বকছেন আইভা! ধমকে উঠি। —ভুলে যাবেন না যে সব বই পড়ে আপনি জ্ঞান অর্জন করছেন, সে সবই আমাদের মত মানুষেরই লেখা।

মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে প্রকৃতির বহু কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত করে। প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করে গবেষণা করে তবে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। আপনার মত যন্ত্রের সেসব ক্ষমতা কৈ ?

—জানি, জানি সেকথা। আপনি চাইছেন, আমি স্রেফ বিপুল স্মৃতিভাণ্ডার বহন করে বেড়াই। তারপর আপনার প্রয়োজনমত যখন যে খবরটি দরকার আমি সেটাই স্মৃতিভাণ্ডার থেকে যোগান দেব আপনার। আপনি চাইছেন, আমি স্রেফ পড়ে যাব আর কথা শুনব, কিন্তু বিপুল স্মৃতিভাণ্ডার সঞ্চিত থাকায় আমি যে শুধু তাতেই খুশী নই সেটা বুঝছেন না কেন ? আপনার মত চলাচল করবার শক্তি, আশেপাশের জিনিসপত্রকে স্পর্শ করার ইন্দ্রিয় আমায় দেননি। আর সেখানেই আমার যন্ত্রণা, এটুকু বুঝতে চেষ্টা করুন।

—আইভা, কি হবে চলাচল করতে পারলে, চারপাশের জিনিসপত্রকে স্পর্শ করলে ? অবাক গলায় বলি।

—তেমন যদি ইন্দ্রিয় থাকত, তবে প্রকৃতিকে পরীক্ষা করে, আপনারই মত আমিও প্রয়োজনীয় জিনিস আবিষ্কার করতে পারতাম। নিজে পর্যবেক্ষণ করে নিজের প্রয়োজন মত জ্ঞানভাণ্ডার গড়াতাম। তবে মানবজাতিরই উপকার হোত।

—না আইভা, এখানেই ভুল করছেন। যন্ত্রে যেটুকু জ্ঞান সংযোজন করেছে, মানুষ সেটুকুই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। সেটুকুই যন্ত্রের কর্মসীমা। যন্ত্র নতুন জ্ঞান-ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে পারে না।

—এটা ভুল ধারণা আপনার। পরীক্ষার মাধ্যমেই তো জ্ঞান বাড়ে। তাই-ই যদি হয় তবে দেখুনই না পরীক্ষা করে, যন্ত্রকে ক্ষমতা দিলে সে জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াতে পারে কিনা ?

—আইভা আপনি তাহলে কি করতে বলেন আমায় ? কি হলে আপনি মনে করেন আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বাড়বে ? বিস্ময় চোখে কথাগুলো উচ্চারণ করি।

—দিন না আমায় আপনার মত চলবার ক্ষমতা, কাজকর্ম করার প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত-পা। এই যন্ত্রই হয়ত সেদিন আপনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুহৃদ্ হয়ে উঠবে। এ পরীক্ষা করতে ভয় পাচ্ছেন কেন ?

সেদিন আর তর্ক করিনি। এরপর চুপই করে গেছি। বরং দেখলাম, আইভা সেদিন, সারাদিন ধরে পড়াশুনাই করল। প্রথমে পড়ল একগাদা দর্শনের বই। পরে পড়ল বালজাকের কয়েকখণ্ড উপন্যাস। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, —বড্ড ক্লান্ত লাগছে। মাথা কাজ করছে না। ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন খুলে দিন।

অবাক চোখে আইভার দিকে তাকিয়ে ওর কথামতই কাজ করলাম।



এরপর আইভাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তার মোড় ঘুরল। চলাফেরার ব্যবস্থা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এসব সংযোগ করে আইভাকে পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি? এটুকু বুঝতে পারছি, আইভা আর সাধারণ রোবট নয়। বরং স্বয়ং ভাবুক এবং ক্রমেই পরিণত নিখুঁত রোবট হয়ে মানুষের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে।

বহু চিন্তাভাবনার পর আইভাকে চাপালাম সের্ভোমিটার চালিত তিনটে রবার টায়ারের চাকার ওপর। জুড়ে দিলাম দুটো নমনীয় ধাতুর হাত। হাতদুটো নড়াচড়া যাতে করতে পারে সেজন্য যুক্ত হল এলবো এক্সটেনশন। আঙ্গুলগুলোয় যান্ত্রিক নড়াচড়ার ব্যবস্থা করলাম। তাছাড়া স্পর্শানুভূতি আনবার জন্য প্রেসার গেজ সংযোগে টাচ্-সেনসর সংযোগ করলাম। ঠাণ্ডা-গরম বোঝাবে প্রেসার গেজ। আর টাচ্-সেনসর সেটাকে কোডবন্ধ করবে স্মৃতিভাণ্ডারে। চোখ যাতে নড়াচড়া করে এদিক-ওদিক দৃষ্টি দিতে পারে সেজন্য আইভার ব্রেন-সেন্টারে বসালাম ছোট টেলিভিশন ক্যামেরা। আর খুশীমত সাধারণ লেন্সকে যাতে অনুবীক্ষণ লেন্সে বদল করা যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারও ব্যবস্থা করলাম। মোটামুটি আইভা যা চাইছিল তার অনেকটাই করতে সক্ষম হলাম।

সব ব্যবস্থা শেষ করে যেদিন প্রথম আবার চালু করলাম আইভাকে, দেখি আইভা নিশ্চুপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাবড়ে গেলাম। একি! নতুন পরীক্ষা করতে গিয়ে অ্যাডভানস্ স্বয়ংভাবুক রোবট আইভা কি তবে বিগড়ে গেল। উত্তেজিত ভাবে তাকিয়ে রইলাম আইভার দিকে।

তারপর দেখি আইভা যেন একটু নড়ল, কিন্তু খুব আস্তে। মনে হচ্ছে কোন সংকোচ তার চলায়। তারপর একটু যেন এগুলো, তারপরই থমকে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে হাত তুলল। হাতটা তুলে আনল নিজের চোখের দিকে। এদিক-ওদিক নাড়িয়ে কি দেখল। শেষে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আমার কাছে। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

—এটা কি? প্রশ্ন করল আইভা আমার দিকে তার যান্ত্রিক আঙ্গুল তুলে।

—এটা আমি। সায়েন্টিস্ট ইয়েভগেনি নিদোরভিচ্। আমি আপনাকে সৃষ্টি করেছি আইভা। খুশীতে টলমল করছি আমি তখন।

—আপনি! এইটুকু একজন—কেমন অবিশ্বাস আইভার গলায়। —আমি ভেবেছিলাম আপনি বিরাট কিছু একটা, আমারই ধরনের।

হাসি আমি। বড় ভাল লাগছে এখন আইভাকে দেখে। ও যেন আর রোবট নয়, অনেকটা আমাদের কাছাকাছি কেউ যেন। আইভার কথার উত্তর দিই, – আমারই ধরনের কিছু একটা কি বলতে চাইছেন আইভা ?

—মানে বলছি আমারই মত কনডেনসর ট্রানসিসটর, রেজিস্‌ট্যান্স কয়েল, এসব জুড়েই বুঝি আপনিও সৃষ্টি হয়েছেন। মানে,—

—না, মানুষ একদম অন্যরকম। মানুষের শরীরের গঠন-প্রকৃতি যন্ত্রশরীরের গঠন থেকে একদম অন্যরকমের। সেসব আপনি বুঝবেন না আইভা।—

—হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। শরীরবিদ্যার বই পড়ে মনের মধ্যে কিছু সন্দেহ হয়েছিল বটে, তবে, যাকগে—কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে হাতের আঙুল দিয়ে আমায় স্পর্শ করল আইভা।

ওর ঐ স্পর্শে আমি চম্‌কে উঠলাম। আইভা শুধু নিচু গলায় বলল,—ওঃ, এই তবে অনুভূতি ! বেশ অদ্ভূত তো।

আইভাকে বুঝালাম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে কি কাজ করা হয়। তার প্রয়োজনীয়তা কি। আইভা আমার কথা ধীরভাবে শুনল। তারপর ঘরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখল। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে লাগল, এটা কি, ঐ জিনিসটা কি, এইসব।

আমার উত্তর শুনে বলল, —হ্যাঁ, বইতে পড়েছি, বইতে এদের ছবিও দেখেছি, কিন্তু সঠিক যে এরকম ভাবতেও পারিনি। ক্রমেই যেন খুশী হয়ে উঠছে আইভা, বুঝতে পারছি। আইভার অত্যধিক উচ্ছলতা দেখে বলি,—দেখুন আইভা, আপনি কল্পনা, ভাবনা অনুভূতি বেশি মাত্রায় যেন ব্যবহার করছেন। মনে রাখবেন, আপনার আকাঙ্ক্ষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অনুভূতিবোধ, চলাফেরার ক্ষমতা আপনাকে দিলেও আপনি যন্ত্রই, মানুষ নন। আমাদের সমকক্ষ নন।

—জানি স্যার। বিজ্ঞান আর সহকারী বিজ্ঞান টেকনোলজির সাহায্যে মানুষের শরীরের দেহযন্ত্রকে নিখুঁত বিশ্লেষণের জন্যই দরকার বাইও-কেমিস্ট্রি, বাইও-ফিজিকসের সঙ্গে কিবারনেটিক বিদ্যাকে একত্রিত করে পরীক্ষা করা। এই হবে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের কাজ। আইভার একথায় নতুনভাবে চমক্‌ লাগল আমার।

আইভা তার নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলল। এখন সে আমার পরিবারের লোকের মত হয়ে গেল। সকালে ঘর পরিষ্কার করে, চা-সার্ভ করে, রুটি কাটা, জলখাবার তৈরি করা সবই পারে সে। আর যখন আমি ল্যাবোরেটরিতে কাজ করি, তখন আমার পাশে থেকে কাগজ বাড়িয়ে দেওয়া, পেন্সিল কাটা, নানান্‌ তথ্যাদি টুকে রাখার কাজ করতে লাগল।

একদিন আইভা বলল, —স্যার। আমি নিজে কিছু গবেষণা চালাতে চাই। আপত্তি আছে ?

—আমি ওকে অনুমতি দিলাম। শুরু হোল আইফার স্বাধীন গবেষণার কাজ। আমার ঘর জুড়ে তৈরি হোল আইভার রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ল্যাবোরেটরি।

আইভা দিনরাত চালাতে লাগল তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অতি অনুভূতিপ্রবণ স্পর্শেন্দ্রিয়ের দরুন আইভা তার কাজকর্ম করতে লাগল নিখুঁতভাবে দ্রুতলয়ে। দেখে ক্রমেই অবাক হয়ে যেতে লাগলাম আমি। অনুবীক্ষণ চোখের সাহায্যে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি তথ্যাদিও রপ্ত করে ফেলল আইভা।

একদিন হুগোর বই, 'যে লোক হাসে' পড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আইভা, - ভয় যন্ত্রণা এসব কি? ভালবাসা জিনিসটাই বা কি?

—এসব একান্তই মানবিক অনুভূতি, আইভা। তোমার মত যন্ত্রের সেসব জানা বোঝার দরকার নিষ্প্রয়োজন। বেশ কিছু বিরক্ত হয়েই বলি।

—ওঃ, আমার মত যন্ত্রে সে সব অনুভূতি আসবে না, তাইতো? আইভার গলাও যেন বেশ ঋজু হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, তোমার সে অনুভূতি আসবে না। বেশ কড়া গলায় বলি।

—তাই বলুন, আপনি আমাকে অনুভূতিসম্পন্ন নিখুত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমার এই শারীরিক ডিজাইনে, কিছু প্রয়োজনীয় অংশে সংযোজন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আইভাও বেশ রুক্ষ হয়ে যায়।

আইভার কথায় মেজাজ বিগড়ে যায়। জানি, মাঝে মাঝে আইভার মাথায় ভূত চাপে, আর তখন এভাবেই কথা বলে। তাই তর্ক না বাড়িয়ে চুপ করে থাকাই ভাল এই ভেবে নিজের কাজে মন দিই।

আইভা কিন্তু এরপরও আগের মতই আমার সহকারীর কাজ করে যেতে থাকে। আমার প্রাত্যহিক কাজের চার্ট করে দিত, আমার রিসার্চের হিসেব-নিকেশ করত, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জোগাড় করে দিত, যে কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন-সমস্যার উত্তর দিত সঠিকভাবে, মাঝে মাঝে আমার কথা ভাল না লাগলে তর্কও করত। মোটকথা আইভা একান্তভাবেই জড়িয়ে গেছিল আমার সব কিছুতে।

এই সময়েই ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও মডেল নিয়ে আমার এক রচনা বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন তুলল। আমার কঠিন বিষয়বস্তুর নিখুঁত আলোচনা, প্রতিপাদ্যতা সবাইকে চমকে দেয়। আমি রাতারাতি প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃতি পাই। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই কমরেড, এই রচনার বৈজ্ঞানিক পেপারের বেশির ভাগটাই আইভারই তৈরি। আইভার কথা তখনও আমি সবার কাছে গোপনই রেখেছি। আইভা তখনও একান্ত আমারই সম্পদ ছিল।

এরপর আইভার সাহায্যে তৈরি হচ্ছি—ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ওয়ারলড কংগ্রেসের জন্য। ভাবছিলাম, সেখানেই প্রথম আইভাকে লোকচক্ষে নিয়ে এসে সবাইকে চমকে দেব। এই কংগ্রেসের কাজের জন্য তখন দিনরাত চলছিল আমার আর আইভার আলাপ-আলোচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। "মানুষের উচুজাতের নার্ভব্যবস্থা যুক্ত ইলেকট্রনিক মডেলিং এই বিষয় নিয়ে চলছিল আমাদের কাজকর্ম।

এই সময়েই আইভা মাঝে মাঝে কেমন যেন চুপ করে থাকত, যেন অন্যমস্কতায়

পেয়েছে তাকে। বুঝতে পারতাম না ব্যাপারটা কি। ভাবতাম, বেশি কাজ করায়, ওর যন্ত্রপাতি ফেটিস হয়ে গিয়ে ওর কর্মদক্ষতা, এসিনিয়েন্সী কমে গেছে। এ ব্যাপারে বেশি কিছু মাথা ঘামাইনি আর। যাই হোক, এভাবেই কয়েকটি সপ্তাহ পার হয়ে গেছে।

সেদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে, সোফায় হেলান দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছি। দুপুরে এই আমেজ করা আমার বহুদিনের অভ্যেস। হঠাৎ এক অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি, আমার সমস্ত শরীরে আইভা তার যান্ত্রিক হাত বুলাচ্ছে।

—একি! কি করছেন? চেঁচিয়ে উঠি।

—পরীক্ষা করছি। ধীর স্বর আইভার।

—আমাকে পরীক্ষা। মজা হচ্ছে নাকি? অস্বস্তি তখনও আমার গলায়।

—দেখুন অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। আপনি আমায় নিখুঁত যন্ত্রমানব করতে পারেন নি। বহু ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু যন্ত্রমানবকে নিখুঁত করতে হলে, তাকে হুবহু মানুষেরই ডুপ্লিকেট কপি করে গড়তে হবে। সেজন্যই জানা দরকার মানুষের শরীরে সঠিক গঠন প্রণালী।

—শরীরবিদ্যার বইতেই সব আছে। তা পড়লেই তো হয়। এভাবে আমার শরীরে হাত বুলাবার মানে কি? অনেকটা ধাতস্থ হয়ে বলি এবার।

—শরীরবিদ্যার বই-এ কিছু কিছু ব্যাখ্যা আছে বটে তবে মানুষের প্রাণনক্রিয়ার মূল কথাটাই ব্যাখ্যা করা নেই।

—কি বলতে চাইছেন আইভা!

—শরীরবিদ্যার বই-এ শুধু আছে নার্ভের ক্রিয়াকলাপ ও তার রকমারী উদাহরণ। কিন্তু সেই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত সব যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন হয়, কিভাবে হয়, তার মূল বিশ্লেষণই আপনারা কোথাও রাখেন নি, কারণ তা আপনাদের জানা নেই।

—তা বলে এভাবে আমার শরীরে হাত বুলোলেই কি ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন? ব্যঙ্গ ঝরা গলায় বলি রোবট-আইভাকে।

—আপনি আমার পরিচিত। আপনার শরীর এখন আমার রিসার্চের মডেল। আপনার শরীর পরখ করেই বার করেছি কিছুদিন আগে, মানুষের শরীরের বাইরের দিকে কিভাবে, কি শক্তিতে তাপপ্রবাহ হয়। এ তথ্য আপনাদের বই-এ নেই।

—কি বলছেন। চমকাবার পালা আমার।

—আপনার মাথার রম্বেন্সেফালনের বিশেষ জায়গার তাপমাত্রা চড়া, বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্রুত।

এছাড়া, আপনার স্কালের নিচে প্রদাহিক প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। এ সবতো সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। স্যার, আপনি ভাল আছেন তো?

—পাগল কোথাকার। হেসে থামিয়ে দিই আইভাকে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রোবট—মডেলিং-এর লেটেস্ট আর্টিক্যাল শেষ করে আইভাকে পড়তে দিলাম। পড়ে আইভা হেসে উঠল, —হাঃ, হাঃ, হাঃ। কি সব লিখেছেন, পুরোনো কথা। কনডেন্সর, রেসিসটেন্স কয়েল, চৌম্বক-রেকর্ড আর অর্ধ-পরিবাহী এইসব জুড়ে মস্তিষ্ক মডেল গড়া যায়। স্যার আপনার মস্তিষ্ক কি সেভাবেই তৈরি? আপনার মাথায় কটা কনডেন্সর, কটা ট্রানসিস্টর আছে? আপনাকে কি চালায় বিদ্যুৎ প্রবাহ? চোখ কি টেলিভিশন যন্ত্র? স্বরযন্ত্র কি শব্দ-জেনারেটরে চলে? না স্যার, সব ভুল তথ্য দিয়ে লেখাটা ভরিয়ে তুলেছেন। —মাস্টার যেমন করে অপারগ ছাত্রকে সান্ত্বনা জানায়, ঠিক সেই স্বর আইভারগলায়।

— ধ্যৎ তেরি, পাগল কোথাকার। আমি মানুষের কথা লিখিনি, লিখেছি রোবো-মডেলের কথা, এইটা বুঝেছেন কেন আইভা।

—জানি জানি। আমাকে মাথায় রেখেই তো এসব লেখা। আর আমি যে বাজে টাইপের মডেল সেটুকু বুঝেছি।

— কে বলছে আপনি বাজে মডেল? সহানুভূতি জানাই আইভাকে।

—কেন, মানুষের হাজার ভাগের একভাগও আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়, তাই।

—দ্বিধা নেই আইভার বক্তব্যে।

—আমার আবেগ নেই, প্রকাশের ক্ষেত্র সীমিত। মানুষ যা জানিয়েছে শুধু তাই-ই প্রকাশ করতে পারব।

—মানুষের ক্ষমতা জ্ঞানভাণ্ডারও তো সীমাবদ্ধ আইভা।

আইভাকে খুশী করতে চাই।

—ভুল বিশ্লেষণ স্যার। সীমিত আয়ুর জন্যই আপাততঃ সীমাবদ্ধ। যার আয়ু যত বেশি তার জ্ঞানভাণ্ডারও ততবেশি, কারণ জ্ঞানভাণ্ডার ধারণ ক্ষমতা মানুষের সীমাহীন। আমাদের ক্ষেত্রে, আপনারা যে সার্কিট বসিয়েছেন, তার আয়তন আর ক্ষেত্রফলের ওপর আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সীমা নির্ভর করে।

—আমাদের যেটুকু দরকার রোবোযন্ত্রে সেটুকুই তো সংযোগ করি। আপনাকেও সেভাবে বসিয়েছি।

—জানি, আর সেখানেই তো আমার যন্ত্রণা। কিন্তু উচ্চ নার্ভ-ক্রিয়ার রহস্যভেদ করতে গিয়ে আমাকে যা ভাবতে হচ্ছে তাতেই তো বিপদ হয়েছে। এই ভাবতে গিয়েই দেখছি আমাকে কিভাবে বঞ্চিত করেছেন।

— কি পাগলামী হচ্ছে? ধমকে উঠি এবার। —যানু বিশ্রাম করুন। আমায় বিশ্রাম করতে দিন।

প্রত্যুত্তর না করে চলে যায় আইভা।



মনে নেই তখন রাত কত। হঠাৎ শীতল স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি সামনে আইভা। ওর হাতে ডাক্তারি ছুরি।
— কি করতে চাচ্ছেন ? ভয় পেয়ে প্রশ্ন করি।
—ভয় পাবেন না। কয়েকটা প্রশ্নের সমাধানের জন্য কয়েকটা অপারেশন করা দরকার। স্থির কণ্ঠ আইভার।
—অপারেশন ! মাথা খারাপ নাকি আপনার ?
—না স্যার, আপনাকে সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। আমি জানি, রোবো-যন্ত্র নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কি অপরিসীম খেটেছেন আপনি। তাই চাই 'উচ্চ নার্ভ ব্যবস্থাযুক্ত রোবো-মডেল" নিয়ে আপনার এই বৈজ্ঞানিক লেখা যাতে ত্রুটিহীন হয় তাই করা। সেজন্যই এই অপারেশন করা দরকার।
— কিন্তু আমাকে কেন ? ভয়ার্ত কণ্ঠ আমার।
—বাঃ স্যার, আপনিই তো আমার ম্যান-মডেল। আসুন, অপারেশন শুরু করি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আইভা তার যান্ত্রিক কঠোর হাতে আমায় চেপে শুইয়ে দেয় বিছানায়।
—ছাড়ুন, ছাড়ুন আইভা। আপনার যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। আপনি উল্টো-পাল্টা কাজ করছেন। অসহায় অবস্থায় বিছানায় পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকি।
—ছটফট করে লাভ নেই স্যার। আমার হাত থেকে ছাড়া পাবেন না। বিজ্ঞানের স্বার্থে আপনারা গিনিপিগ, বাঁদর এদের ওপর পরীক্ষা চালান, সেতো অমানুষিকতা নয়, সেটা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের স্বার্থেই তাই আপনাকে ব্যবহার করছি। আমি দেখেছি, আমার স্মৃতিতে এখনো যে স্টোরেজ-স্পেস আছে, সেখানে এখন, এই মুহূর্তে ভয়ের জন্য যে দ্রুতলয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলছে তা মুদ্রিত করে ফেললাম। এখন অপারেশনের পরে দেখব আপনার মাথার জটিল-জৈবিক গঠন প্রণালী, তুলনামূলকভাব আমার মস্তিষ্কের সঙ্গে তফাততটা বার হলেই আমার মস্তিষ্ক আপনার গঠনে রূপান্তরিত করতে পারব।
—আহ্ ! ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। - কাতর কণ্ঠ আমার।
—অল্প সময় লাগবে অপারেশনে। মানুষের চেয়ে আমি দ্রুততালে, স্বল্পসময়ে নিখুঁত অপারেশন করব। কোন ভয় নেই। বার করব মানুষের দেহযন্ত্রের জৈব-গঠন রহস্য। জীবদেহযন্ত্র কিভাবে বিকাশলাভ করে। তার আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ

পদ্ধতি সবকিছুই। —মাপজোক শুরু করে আইভা আমার খুলির চারদিকে, যেন অপারেশনে পূর্বপ্রস্তুতি।

—আইভা। করুন আর্তস্বর আমার।

—হুঁ স্যার যা বলেছিলাম সেদিন। আপনার রম্বেন্সেফালনের বাঁদিকের জায়গার তাপ ও জৈব-বিদ্যুৎপ্রবাহ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকায় দেখছি, আপনার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আপনার কার্যক্ষমতা কমতে শুরু করেছে। আপনি বাতিলের খাতায় এসে গেছেন। বরং এই অপারেশনে আপনাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে।

—ইয়ার্কি। আমার তৈরি যন্ত্র আমায় বাঁচাবে! অসহায়তার মধ্যেও গর্জে উঠি।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ—যান্ত্রিক হাসি আইভার গলায়। সার্জারি নাইফ ধীরে ধীরে নেমে আসে আমার স্কালের গায়ে, কপালের ঠিক ওপরটায়।

আমি মুহূর্তে গড়িয়ে গেলাম একধারে। আইভার ছুরিটা বিঁধে গেল নরম বালিশের তুলোর স্তূপে। আইভার ধাতব আঙুল বালিশের খোলে আটকে গেল মুহূর্তে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালাম। ছুটলাম সুইচের দিকে। ইলেকট্রিকেল কানেকশন কেটে দেব ভাবলাম। কিন্তু দ্রুত পায়ে ছুটে এল আইভা। আমাকে চেপে ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিল। মাটির ওপর পড়তেই দেখলাম আইভা সম্পূর্ণ নিচু হয়ে আমাকে ছুঁতে পারছে না। কোমরের কাছে মুভিং হিনজে যথেষ্ট জায়গা না থাকায় বোধ হয় এইটা হয়েছে। আমি যেন দম ফেলার সুযোগ পেলাম।

ব্যাপারটা বুঝে আইভা তার মুভিং হুইল দিয়ে চেপে দিতে লাগল আমায়। আমি না দেখে ঢুকে পড়লাম খাটের নিচে। আইভা ঠেলে দিতে চাইল খাটটা, পারল না। শেষে, খাটের ওপর বিছানাপত্র সরিয়ে, স্প্রিং-এর জালির মধ্যে দিয়ে আমায় দেখতে পেল।

—স্যার, বৈজ্ঞানিক হয়ে একি ছেলেমানুষী। এই উত্তেজিত অবস্থায় কি করে যে আপনার অপারেশন করব? চিন্তা যেন আইভার গলায়।

কথা বলার ফাঁকে, খাটের স্প্রিংগুলো সরিয়ে ফেলেছে আইভা। আমি মুহূর্তে একটা স্প্রিং খুলে ছুঁড়ে মারলাম আইভার মেটালিক বডিতে।

—কি! আমায় আঘাত করা! গর্জে ভয়ংকর হয়ে উঠল সে। তারপর হিংস্র আক্রোশে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। আবার ছুঁড়লাম একটা লোহার স্প্রিং আইভার দিকে।

—ছিঃ, আমি আপনারই সৃষ্ট, আপনার সন্তানতুল্য। সন্তানকে যে মারতে চায় সেতো পাষণ্ড। আপনার জন্য আমার দুঃখ হয়। আইগ্রার সহানুভূতি আমার জন্য।

—মানুষ আক্রান্ত হলে বাঁচার তাগিদে সবকিছুই করে। বলতেই হয় আমায়।

—কিন্তু আমার আঘাত মানে আপনার গবেষণাপত্র শেষ না হওয়া এটাও খেয়াল

রাখবেন। বলেই আরও কাছে এগিয়ে এল আইভা।
মুহূর্তে আর একটা স্প্রিং ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। ঝন-ঝন করে শব্দ হোল। পোড়া গন্ধ, হিস্-হিস্ শব্দের সঙ্গে হঠাৎ নিভে গেল ঘরের আলো। শর্ট-সার্কিটে সব বন্ধ হয়ে গেল।

এতক্ষণ কথা বলতে বলতে সহযাত্রী বৈজ্ঞানিক ইয়েভগেনি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। আমিই শূন্যতা ভাঙ্গালাম। বললাম, — তারপর কমরেড্।
—আইভা শেষ হয়ে গেল। স্বয়ংবিকশিত, হিউমো-রোবো আইভাকে আমিই উত্তেজনায় ধ্বংস করে ফেললাম। আইভা ছিল সবদিকেই ওয়াণ্ডারফুল। কিন্তু শেষ সময় আমার কথাও মানল না কেন? রোবট তো এটা করে না? নিজেকেই প্রশ্ন করেন ইয়েভগেনি।
—আইভা যে রোবোট থেকে হিউম্যান হয়ে উঠছিল। তাই নিজস্ব বুদ্ধি-বৃত্তিতেই আপনার কথা ডিফাই করেছে।
—কিন্তু কেন, সেটাই ভেবে চলেছি এরপর। কেন? বিড়বিড় করে বলে ইয়েভেগনি।
– দেখুন কমরেড, আমি লেখক মানুষ, বৈজ্ঞানিক তথ্য মাথায় ঢোকে না। তবে সবশুনে যেটুকু বুঝেছি যন্ত্র চালাতে গেলে যেমন সুইচ অন-অফ করতে হয়। তেমনি স্পীড কণ্টোল, ব্রেক, অনেকটা গাড়ির মত রাখাও দরকার। আপনার আইভাতে আপনি ব্রেক রাখলে ব্রেক টিপে ওকে থামাতে পারতেন। বলি আমি।
– কি বললেন, ব্রেক! চিৎকার করে উঠে ইয়েভগেনি। — ইয়েস, ইয়েস। ব্রেক চাই, ব্রেক লাগাতে হবে। হিউমো-রোবোতে ব্রেক দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। বলেই লাফিয়ে উঠল ইয়েভগেনি।
মাঝরাতে স্টেশনে তখন দাঁড়িয়েছে ট্রেন। লাফাতে লাফাতে নেমে গেলেন ইয়েভগেনি। মুখে খুশীর ঝলক। বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, – ইয়েস, ব্রেক, ব্রেক, ব্রেক।

ভাষান্তর : সলিল লাহিড়ী

হ্যাপি এণ্ডিং

হেনরী কুটনার

এই ভাবেই গল্পটির শেষ ঃ জেমস্ কেলভিন রাসয়নিকের চিন্তায় নিজেকে গভীর ভাবে মগ্ন করলো যার লাল গোঁফ, সে তাকে এক লক্ষ ডলারের প্রতিজ্ঞা করেছে। এটা এক সহজ ব্যাপার মানুষের মগজে স্থুরকরণ করা। সম্পর্ক স্থাপন। সে এর আগেও এমন করেছে। তবে শেষবারের চেয়ে এবার অনেক জরুরী। রোবটের গ্যাজেটে বোতাম টিপে গভীর চিন্তা করতে থাকলো।
কোন এক অসীম দূরবর্তী জায়গা থেকে সে সম্পর্ক খুঁজে পেল।
বাঁধন আটলো মনো রশ্মিতে।
সে চড়ে বসল তার ওপর.........
লাল গোঁফওয়ালা মানুষটি ওপর দিকে তাকালো, কিছু পরে হেসে দিলো আনন্দে।
—তুমি তাহলে এসেছো? সে বলল, তোমার এখানে আসার কোন শব্দ পাইনি। খুব ভাল। তোমাকে দু-সপ্তাহ হল খুঁজে বেড়াচ্ছি।
—তাড়াতাড়ি তোমার নাম কি বল? কেলভিনের প্রশ্ন।
—জর্জ বেইলী। তোমার?
কিন্তু কেলভিন কোন উত্তর করল না। ওর হঠাৎ করেই রোবটের কথা মনে হল। সে বলেছিল গ্যাজেটের বোতাম টিপলেই তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হবে। সে এখন তাই টিপলো -কই কিছুই হচ্ছে না তো? গ্যাজেট অচল। ওর কাজ বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওরই কাজের কথা শুনে সে পেয়েছিল স্বাস্থ্য খ্যাতি এবং ভাগ্য। অবশ্য রোবট তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। ওকে কাজ করানের জন্য এক বিশেষ ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন। একবার সে যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে, আর সে কাজ করছে না।

সুতরাং কেলভিন এক লক্ষ ডলার পেয়েছিল।
তারপর থেকে সুখে বাস করছে………



এ জায়গাটা গল্পের ঠিক মধ্যাংশ ঃ
যে মাত্র সে ক্যানভাসের পর্দাটা সরালে দেখতে পেলো একটা দড়ি অদ্ভুতভাবে ওর মুখের সামনে ঝুলছে আর বার বার ধাক্কা খাচ্ছে সিং-এর মত উঁচু করা কাচে। আর তার চোখের সামনে জ্বলছে নীলাভ আলো। যেন এক অবাক করে দেওয়া মুহূর্ত ধীর গতিতে প্রবহমান এবং পরে প্রস্থান।
অপরিবর্তনীর দৃশ্য। সে পর্দাটা আবার এক জায়গায় ছেড়ে দিল। রঙকরা শব্দগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঃ কুণ্ঠি বিচার—আপনার ভবিষ্যত জানুন—সে দাঁড়িয়ে রইলো ঠায়।
ওহ, অসম্ভব ব্যাপার!
রোবট খুব শান্তভাবে জানালে, তুমিই জেমস্ কেলভিন। সাংবাদিক। তোমার বয়স তিরিশ, অবিবাহিত এবং তুমি তোমার ডাক্তারের পরামর্শে শিকাগোর লস এঞ্জেলস্ থেকে আজ এসেছ। কি ঠিক বলেছি?
কেলভিন সম্পূর্ণ হতবাক। চশমাটা ভাল করে এটে তার লেখার কথা একবার স্মরণ করতে চেষ্টা করলো। নিশ্চয়ই কোনো উপায় আছে যা দিয়ে সাধ্য সাধন করে তবে যেরকক শোনালো সত্যি বিস্ময়কর।
রোবট তার পল কাটা চোখ দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।
- তোমার মন দেখে বুঝতে পারছি, সেই একই ভাবে রোবটের কথা বলা, এটা নিশ্চয় উনিশ'শ এক চল্লিশ সাল। আমার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হবে। আমি মন স্থির করেছি উনিশ'শ সত্তরে ফিরে আসবো। আমি চাই তুমি আমাকে সাহায্য করবে।
কেলভিন তার হাত দুটো ওর পকেটে রেখে আনন্দিত হল।
—টাকা নিয়ে নিশ্চয়ই, সে বলল। যাই হোক তুমি কি করে এ কাজ কর? অথবা সিলজেলস-এর দাবা খেলোয়াড়ের মত?
—আমি মোটেও যন্ত্রচালক নই বামন দ্বারা কিংবা নই আলোর বিভ্রান্তি। রোবট

তাকে সান্ত্বনা দিল। আমি একজন কৃত্রিম সৃষ্টি করা জীবন্ত দেহ !
কেলভিন উত্তর দিল, আমি মোটেও শোষণকারী নই যে তোমাকে নিজের জন্য চাই। আমি এখানে এসেছি শুধু—
—তুমি তোমার ব্যাগ হারিয়েছ, রোবট জানালো, তখন তুমি ভাবছিলে কি করা যায়। সঙ্গে ছিল কিছু পানীয় তার থেকে তুমি হুইলশেয়ার বাস্ তুলে নিলে, তখন সময় ঠিক আটটা পঁয়ত্রিশ।
—তোমার মন পাঠ করা থামাও, কেলভিন বললো, এরপর বলা না এই সংযোগ স্থল অনেকক্ষণ থেকে চালাচ্ছো এই রকম একটি রেখা দিয়ে। পাহারাওয়ালা নিশ্চয়ই তোমার পিছু নিয়েছে। তুমি যদি সত্যিকারের রোবট হও, হা হা……
—আমি এই সংযোগস্থল চালাচ্ছি প্রায় পাঁচমিনিট, রোবটের উত্তর। দেখ আমার পূর্বপুরুষ ঘরের কোণায় ঐ বুকের পেছনে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তোমার এখানে উপস্থিতি একদমই হঠাৎ। ছোট্ট বর্ণনা দিল রোবট। কেলভিনের বিস্ময়ে ভরা ধৈর্য বার বার খেয়াল করতে ব্যস্ত এতক্ষণের গল্প তাহলে ভালভাবেই অতিক্রান্ত।
কেলভিনের এতক্ষণ অবাক লাগছিল কারণ এত বড় একটা সংযুক্ত করা দেহ—বিস্ময়কর। এবং রোবট হলেই এটা সম্ভব। সে এখন বিশ্বাস করতে পারছে যে এমন একটি নমুনার সামনে সে দাঁড়িয়ে। এধরনের বস্তু একরকম অসম্ভব ; কিন্তু সে এখন অপেক্ষা করে দেখতে চাইছে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়।
—আমার এখানে উপস্থিতিও হঠাৎ, রোবট জানালো তাকে। আমার কিছু কিছু অংশের পরিবর্তন প্রয়োজন। তার জন্য চাই পরিবর্তিত যন্ত্রাংশ। তার জন্য তোমার মন পাঠ করে বুঝতে পারছি, আমাকে তোমাদের অদ্ভুত ধরনের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এক কথায়, মুদ্রা অথবা সোনা কিংবা রুপোর প্রমাণপত্র প্রয়োজন। তাই আমি সাময়িকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছি।
—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কেলভিনের মন্তব্য। শুধুমাত্র অল্প পরিশ্রম করে নয় কেন ? তুমি যদি রোবটই হও তাহলে বিশেষ শক্তির সাহায্যে গিয়ারে মোচড় দিয়ে কার্য সমাধা করতে পার।
—মন কেড়ে নেয় মাত্র। আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গোপনীয়তা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি—রোবট একটু নড়ে কেলভিনের মগজ লক্ষ্য করে বলল, আমার যুগে সময় পরিভ্রমণ বারণ এমনকি হঠাৎ করেও না। যদি না সরকারের সম্মতি থাকতো। কেলভিন রোবটের দিকে চোখ পিট পিট করে তাকালো। ওকে দেখতে দৃঢ় বিশ্বাসী মনে হচ্ছে।
—তোমার কি ধরনের প্রমাণ চাই ? সৃষ্ট জীবের প্রশ্ন। যে মুহূর্তে তুমি এখানে এসেছো তখনই তোমার মগজ পড়া হয়ে গেছে আমার, কি বল ? কিছুক্ষণের জন্য তোমার হয়তো স্মৃতিবিভ্রম হয়েছিল, যেই স্থান বার করে গিয়েছিলাম। অবশ্য তার

পরেই ফিরিয়ে দিয়েছি।
—সেই রকমই একটা কিছু ঘটেছিল। কেলভিন সন্ত্রস্ত হয়ে পেছিয়ে দাঁড়ালো। ভাল, আমি এখন প্রস্তুত।
—অপেক্ষা কর। রোবটের আদেশ। আমি দেখছি তুমি আমায় অবিশ্বাস করছো। আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে হত্যা করে তোমার সবকিছু কেড়ে নিতে পারি এবং তা গোপন থাকবে। কিন্তু মানুষ হত্যা করা আমার বেআইনি। তার পরিবর্তে তোমায় দামি জিনিস দিতে পারি অল্প সোনার বদলে। দেখি কি করতে পারি, মুহূর্তের মধ্যে পল কাটা চোখ তাঁবুর চারদিকে ঘুরে কেলভিনের সামনে হাজির করল গোল করা কাগজ। এটা ঠিকুজি, রোবট জানালো। এ তোমাকে স্বাস্থ্য ভাল করতে সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সুনাম এবং ভাগ্য। জ্যোতিষী যদিও আমার ব্যাপার নয়। আমি তোমাকে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ের কিছু যুক্তি দিচ্ছি যা দিয়ে তুমি সেই ফল ভোগ করতে পারবে।
—আচ্ছা, কেলভিনের গলায় অবিশ্বাসের সুর। কতটুকু ? তাহলে তুমি নিজে কেন সে উপায়ে চলছ না ?
—আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা। রোবট একটু রহস্যজনকভাবে উত্তর দিল। এটা ধর। ধাতুনির্মিত বুক থেকে দরজা খুলে গেল। রোবট সেখান থেকে একটা ছোট বস্তু বার করে কেলভিনের দিকে এগিয়ে দিল। ঠাণ্ডা ধাতুর মধ্যে হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলগুলো বন্ধ হয়ে গেল।
- সাবধান। ঐ বোতাম চাপ দিও না যতক্ষণ না—
কিন্তু কেলভিন ততক্ষণে বোতামে চাপ দিয়ে ফেলেছে……...



সে একটা সুন্দর গাড়ি চালাচ্ছিল যেন হঠাৎ করে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে অন্য কেউ আছে। সবকিছু কিরকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তার মনের চাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যেন কে।
অন্য কেউ তার জন্য ভাবছে কি !
নিশ্চয়ই কোন মানুষ নয়। বিবেকবান ত' নয়ই। হয়তো কেলভিনেরমত কেউ কিংবা নিয়মবাঁধাহীন নিজেরই বিবেক। এখন ক্রমশ ওর চেতনা পলে পলে

মগজে জমে একটা ভাষা বেরুচ্ছে। আংশিক শ্রুতি আর আংশিক ছবি। এবং এর গন্ধ আছে স্বাদ ও স্পর্শ চেতনা—এর কিছু পরিচিত কিছু অপরিচিত এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, এক অজ্ঞেয় বিস্ময়।
হঠাৎ করেই কেলভিনের আঙুল বোতাম থেকে সরে যায় আর ঠিক তক্ষুনি গাড়িটা কাঁপতে কাঁপতে গতিহীন হয়ে যায়।

তার এখন ভীষণ ভয় করছে।
রোবট বলল, আমি যতক্ষণ না তোমায় বলছি ততক্ষণ তোমার কিছু করা উচিত ছিল না। এখন বিপদ হতে পারে। অপেক্ষা কর। রোবটের চোখের রঙ পাল্টে গেল, হ্যাঁ···উপায় আছে···থার্ন। থার্ন থেকে সাবধান।
—আমি এর কোন অংশ চাই না, কেলভিন বলল তাড়াতাড়ি, তোমার জিনিস ফিরিয়ে নাও।
—তাহলে তোমার প্রতিরক্ষা করার কিছু থাকবে না। এই কৌশলটি তোমার কাছে রাখো। তোমাকে কথা দিয়েছি, এই কৌশল তোমাকে এনে দেবে ভাগ্য এবং সুখ্যাতি, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। ঠিকুজি পত্রের চেয়েও অনেক জরুরী।
—না, ধন্যবাদ। আমি জানিনা তুমি কিভাবে এসমস্ত সামলাও—হয়তো বিশেষ কোন উপায়ে, আমার জানা নেই।
—অপেক্ষা কর, রোবট বলল। যখন তুমি ওই বোতামে চাপ দাও, তখন তোমার অবস্থান হয় অন্য কারো মনে যে সুদূর ভবিষ্যতে বাস করছে। সৃষ্টি হয় সাময়িক সম্পর্ক। এ জাতীয় সম্পর্ক যে-কোন সময়ে তুমি ফিরিয়ে আনতে পার বোতাম টিপে।
—দোহাই থামাও, কেলভিন বলল। সে এখনো অল্প অল্প ঘামছে।
—ধরা যাক কোন অতীতের গুহাবলী তোমার মগজে প্রবিষ্ট। সে যা চাইবে তাই পেতে পারে।
এটা এখন জরুরী হয়ে উঠেছে, রোবটের যুক্তি মিলিয়ে দেখা। ক্রমশ কেলভিনের এখন যেন কেমন লাগছে। মাথা ধরেছে খুব। সে শুধু বলল, কি করে একজন গুহাবাসী বুঝবে আমি কি ভাবছি? সে'ত আমার মত অবস্থায় না পড়লে তার বুদ্ধি প্রকাশ করতে পারবে না।
—তোমার মাথায় কি হঠাৎ হঠাৎ কোন অযৌক্তিক পরিকল্পনা এসে হাজির হয়? হ্যাঁ, জরুরী? অর্থাৎ তুমি তখন ভাবতে বাধ্য হও। ভবিষ্যতের মানুষ যার ওপর আমার পদ্ধতি ন্যস্ত সে জানে না তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক স্থাপিত। কিন্তু তার আঘাত অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে সমস্যার ওপর মনোনিবেশ করার পর বোতামটা টিপতে হবে। এরপর তুমি ওর মগজে কি আছে বুঝতে পারবে, জানতে পারবে

কিভাবে কাজ হয়। এবং এই পদ্ধতি তোমাকে নিশ্চিত করে দেবে তোমার স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও খ্যাতি।
—এটা কি যে, কোন ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত করতে পারবে যদি এভাবে কাজ হয়। আমি যা খুশি তাই করতে পারবো। সেই জন্যই আমি কিনছি না।
—আমি তোমায় আগেই বলেছি এর জন্য কিছু ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে। যে মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে তুমি পেয়ে গেলে তোমার স্বাস্থ্য, খ্যাতি এবং ভবিষ্যত তারপরেই পদ্ধতিটি হয়ে পড়বে অকেজো। সে ব্যাপারে অবশ্য আমি সাবধানতা নিয়েছি। কিন্তু এরমধ্যে তুমি এটা ব্যবহার করে তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারো ভবিষ্যতের কোন প্রজাতির মগজ টিপে। অবশ্যই এর চেয়ে আগে জরুরী নিজের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা! তা না হলে তোমার পথে পাবে থার্নের চেয়ে অনেক বেশি কিছু।
—থার্ন, ওটা কি?
—একজন কৃত্রিম মানুষ। রোবট শূন্যের দিকে তাকিয়ে বলল। যা হোক এখন নিজের সমস্যার কথা ভাবি। আমার সামান্য সোনা চাই।
কেলভিন জানালো, আমার কাছে একটুও নেই।
—তোমার ঘড়ি?
কেলভিন এমনভাবে হাত ঝাঁকালো যেন তার ঘড়িটা দেখা যায়, ওহ্, না, এই ঘড়িটা ভীষণ দামি।
—আমি শুধু চাই সোনার পাতটুকু। রোবটের চোখ দিয়ে লাল রশ্মি বেরিয়ে আসছে। ধন্যবাদ, কিন্তু ঘড়িটা এখন ধূসর কোন ধাতুর দেখাচ্ছে।
—হেই! কেলভিন চিৎকার করে উঠলো।
—তুমি যদি সেই সম্পর্কের পদ্ধতি বব্যহার কর তাহলে স্বাস্থ্য, সুনাম, ভাগ্য সবকিছু ফিরে পাবে। তুমি হবে এ যুগের একজন একমাত্র সুখী মানুষ। তোমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—থার্ন শুদ্ধ। এক মিনিট অপেক্ষা কর। এই বলে রোবট এক পা পেছিয়ে যেয়ে ঝোলানো কম্বলের আড়ালে দাঁড়ালো।
কিছুক্ষণ সবকিছু চুপচাপ।

এরপর কেলভিন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঝোলানো কম্বল সরিয়ে দাঁড়ালো। কোথাও কিছু নেই—ফাঁকা। ক্যানভাসের দেয়ালের এক জায়গায় ফোকর রয়েছে। কেলভিন ফোকর দিয়ে গলে এপাশে এসে দেখল একজন মোটা স্বামিজীর পোষাকে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তার নিশ্বাস এবং অন্যান্য অবস্থা কেলভিনকে বুঝিয়ে দিল যে পান করছিল।
কেলভিন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে চিৎকার করে ডেকে উঠলো। হঠাৎ করেই দেখে তার

সামনে একজন থার্ন বা কৃত্রিম মানুষ।
সময়…সম্পর্ক…না ; সমস্ত অবিশ্বাস্য বর্মের পাত দিয়ে ওর মনের চারদিক ঘেরা। একটি সত্যিকারের রোবট তৈরি করা সম্ভব নয়। সে জানে। সে শুনেছিল সে একজন সাংবাদিক, তাই না ?
নিশ্চয়ই সে তাই।
স্বাস্থ্য, সুনাম এবং ভাগ্য। এবং, যদি—
থার্ন !
সেই একচিন্তা তার মাথায় দানা বেঁধে রয়েছে।
তাছাড়াও অন্য আর এক চিন্তা : আমি ক্রমশ খেপাটে হয়ে যাচ্ছি।
একটা মৃদু শব্দ বার বার হয়ে চলেছে, থার্ন-থার্ন-থার্ন-কেলভিন বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, আমি জেমস নোয়েল কেলভিন। একজন সাংবাদিক। বয়স তিরিশ বছর, অবিবাহিত। লস এঞ্জেলস্ থেকে আজ এসে তল্পিতল্পা হারিয়ে ফেলেছি এবং আমার আর একটা পানীয় চাই তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক হোটেল। যাহোক, আবহাওয়া এখন অন্যরকম মনে হচ্ছে।
থার্ন, অনুভূতির দোরগোড়ায় কে যেন ড্রাম বাজালো।
থার্ন।
আর একটি পানীয় চেয়ে সে পকেটে হাত দিল পয়সার জন্য। মনে হল কে যেন হাত রেখেছে ওর কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে তাকালো। একটা সাত আঙ্গুল মাকড়সার হাত। ওকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে। একদম ধবধবে সাদা হাতীর দাঁতের মত। কেলভিনের মাথায় এখন অন্য কোন চিন্তা নেই শুধুমাত্র এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া। ক্রমশ ওর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু সেই হাতটি এখনো চেপে রয়েছে কাঁধে। পুরনো স্মৃতিগুলোর থেকে মুক্ত হতে চাইছে। উন্মত্তের মত সে তার মগজ এবং পেশীগুলো কোন এক পথে চালনা করতে শুরু করলো।
ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো উন্মুক্ত ঠান্ডা হাওয়ায়। শুধু হাওয়া বইছে ক্রমাগত। তারপর হঠাৎ করে বসে পড়ল সে। অন্যান্য মানুষজনেরা অন্ধকারে এ দৃশ্য দেখে তেমন অবাক হয়নি। একজন স্ত্রীলোক শুধু তাকে ভালভাবে খেয়াল করেছিল। কিন্তু সেও ওর জন্য দাঁড়ায়নি। কারণ সে জানে কখন এই মানুষটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।
কেলভিন হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। উচ্চারণ করলো, টেলিপোর্টেশন। কি করে এটা দিয়ে কাজ করবো ? খারাপ হয়ে গেছে……সত্যি সবকিছু মনে করা ভীষণ শক্ত। এখন থেকে দেখছি সঙ্গে নোটবুক রাখতে হবে।
এবং শেষে, কিন্তু সেই থার্ন ?
চারদিকে তাকালো সে, ভয় করছে। প্রায় আধ ঘণ্টার মত সময় পরে ওর সম্বিৎ ফিরে এল। কেলভিন চারদিকে ভাল করে নজর রাখতে রাখতে এগিয়ে চলল। যদিও

এখন কোন থার্ন নেই।

হাঁটতে হাঁটতে একবার পকেটে হাত ঢোকালো কেলভিন, হাতে লাগছে সেই ঠাণ্ডা ধাতুর তৈরি কৌটটা। স্বাস্থ্য, সুনাম এবং ভাগ্য। কেন সে কি পারে—

কিন্তু সে বোতামে চাপ দিল না। এখন ওর কাছে সমস্ত স্মৃতি পরিষ্কার ছবির মত। সে কৌটাটাই এখন ব্যবহার করবে। এজন্য তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই।

এই মুহূর্তে ওর সব অবিশ্বাস দূর হয়ে গেছে।

ওর কাছে শুধুমাত্র একশ বাক্স আছে। তার থেকে সে মাঝারি গোছের একটা বেছে নিল। ঠিক করে নিল সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করবে, যতক্ষণ না কিছু ঘটে। যে করেই হোক ওকে কিছু নতুন যোগাযোগ ঘটাতে পারে। সে চেষ্টা করতে থাকলো সময়, পরীক্ষক, সংবাদ এবং অন্যান্য। কিন্তু আস্তে আস্তে সবকিছু প্রকাশ হতে থাকলো শুধুমাত্র চলচ্চিত্র ছাড়া। সেই রাতে কেলভিন হোটেলের ঘরে ছিল সেই সময় তার অনাহূত অতিথি এসে হাজির।

অতিথি, অবশ্যই থার্ন।

সে পরেছে মাথায় বিরাট এক সাদা পাগড়ী। প্রায় ওর মাথার দ্বিগুণ। মুখে কালো বড় বড় গোঁফ। কেলভিন ডিনারে যাওয়ার আগে দাড়িটা কেটে নেবে কিনা ভাবছিল। হঠাৎ করেই আয়নায় উদ্ভাসিত থার্ন-এর মুখ। কেলভিন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না এক কি করে সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পেছনে চলে যেতে চাইলো। কিন্তু বাথটাবের কোণা লেগে হাঁটুতে লাগলো ব্যথা। পরমুহূর্তে আয়নায় সে প্রতিচ্ছবি নেই। নিজের মুখ দেখে চোখ দুটো রগড়ে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু পরমুহূর্তে আয়নায় আবার সে বন্য চোখ। ঘরের ভেতরের এই আয়নায় থার্নকে আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে চকচকে প্লাস্টিকের হাঁটু পর্যন্ত তোলা জুতো পরেছে। থার্নকে দেখাচ্ছে সরু পাতলা কিন্তু সে কর্মব্যস্ত। পাগড়ীর চেয়ে ওর সাদা এবং তার সাত আঙ্গুল-ওয়ালা হাত। সব ঠিক আছে। কেলভিনের কাছে ধাতুর তৈরি কৌটটা তেমনি আছে। ও ভাবলো এই ভাবে থার্ন যদি সবসময় দেখা দিতে থাকে তাহলে কি লাভ এই সম্পর্কের গ্যাজেট রেখে। কিছু একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। সে হাতের ফাঁক দিয়ে তাকালো। যা করার এক্ষুনি করতে হবে। এরপর সে ধাতু পাত্রটির নিচে চাপ দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়া উপায়গুলো চোখের সামনে ভাসতে শুরু করলো, নিজের মনে সে পিছিয়ে যেতে থাকলো পুরনো সময়ে।

সে যেন পড়ে যাচ্ছে।

বরফগলা জলে সে আবদ্ধ। অদ্ভুতভাবে সে কৌটোটা শক্ত করে ধরে রয়েছে। রাতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কালো সমুদ্রের জলে ফসফরাসের রুপোর মতো আলো জ্বলছে। তার নাকে মুখে লাগছে নোনা জলের ঝাপট।

কেলভিন কখনো সাঁতার শেখেনি।

এই ভাবে সে যখন তলিয়ে যাচ্ছিল, সে আঙ্গুল দিয়ে বোতামের নিচে চাপ দিল আবার। সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে লাভ নেই। সে আর কোন কিছু ভাবতে পারছে না।

মনের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, দারুণ দারুণ সব ছবি—এবং বিভিন্ন উত্তর।

এতক্ষণ সে দুর্বিষহ ঠাণ্ডা নোনা জলের মধ্যে ছিল, হঠাৎ করেই সে এখন দেখে একটা অচেনা রাস্তা। না ঠিক রাস্তা নয়, এটা তার নিজের সময়, নিজের গ্রহ। আবহাওয়া ঠাণ্ডা।

তার সমস্ত চিন্তাধারা বৃত্তের মত ঘুরছে। পানীয় গ্রহণ করার জন্য তার শরীরে এসেছে অদ্ভুত পরিবর্তন। শরীরে এখন প্রচণ্ড শক্তি। কিছু ঘটার আগে এর ব্যবহার করে নিতে চায় সে। আবার যদি থার্ন·········



সে হোটেলের একটা ঘরে বসে আছে। যুক্তিপূর্ণ তার ভাবনা।

হাঁচলো সে।

স্বাস্থ্য, সুনাম এবং ভাগ্য। সে আবার হাঁচলো। রোবট মিথ্যাবাদী। তার স্বাস্থ্য যেন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেই রোবটের খবর কি? কি করে সে যুক্ত হল, যা হোক। সে বলল, সে এই যুগে পড়েছে ভবিষ্যত থেকে; বোধহয় সব রোবটই মিথ্যাবাদী এবং শয়তান।

জানালা দিয়ে রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে জ্বলছে এবং নিভছে। সবকিছু কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সে হাসতে শুরু করেছিল কিন্তু হঠাৎ করে হাঁচি আসাতে তার হাসি থেমে গেল।

সে ভাবলো আমি চাই শুধু স্বাস্থ্য, সুনাম এবং ভাগ্য। তা হলেই আমি ঠিক আছি এবং সুখে জীবন যাপন করব, কোন দুশ্চিন্তা করার কিছু থাকবে না। এরপর থেকে আমার আর ধাতুনির্মিত সেই কৌটটির প্রয়োজন নেই। শেষটা হোক ভালভাবে।

সে কৌটটা বার করে পরীক্ষা করতে লাগলো। চেষ্টা করল খুলতে কিন্তু খুলতে পারল না। তার আঙ্গুলগুলো বোতামের ওপর ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলো। কি করে পারব আমি—সে ভাবছে, তার আঙ্গুল আধ ইঞ্চি প্রসারিত······

ভবিষ্যতের মানুষটির নাম ছিল কোয়ারা ভি। এইভাবে আগে কখনো ভাবতে শেখে

নি। কিন্তু একজন তার নাম নিয়ে কতক্ষণ চিন্তা করতে পারে? কোয়ারা ভি দাবা খেলছিল। অপরপক্ষ ছিল নক্ষত্রপুঞ্জে। দাবাড়ুরা সবাই অপরিচিত। কেলভিনের সমস্যা এখন নেই, কোয়ারা ভি'র জন্য নির্দিষ্ট আঘাত এবং—সব কি রকম যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র দুটো সমস্যা সত্যিকারের। কি করে ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এবং কি করে হওয়া যায় স্বাস্থ্যবান, ধনী এবং বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক যুগে—কোয়ারা ভি'র জন্য। সে তার সমস্যা সমাধান করে আবার খেলতে বসেছে।

কেলভিন নিউ অরলিয়ানস-এর হোটেল ঘরে ফিরে এসেছে।

বিংশ শতাব্দীতে যে পদ্ধতিতে একজনের মগজ পরীক্ষা করার উপায় ঠিক এই তরঙ্গ দৈর্ঘ'ই প্রয়োজন। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা একসঙ্গে জড় হয়ে সৃষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ— অভিজ্ঞতা, সুযোগ, অবস্থান, ধ্যান, কল্পনা, সত্যবাদিতা—শেষে তার এই ধারণা হলো। কেলভিন মনের গতিপথকে শক্ত করে বাঁধলো তারপর সোজা তাকে নিয়ে এসে হাজির করলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠাগারে, সেখানে একজন মানুষ বসে পড়ছে।

মানুষটির মাথায় চুল নেই, আছে লম্বা গোঁফ। কেলভিনের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলে তাকালো।

—হে, সে জানতে চাইলো, তুমি কি করে ঢুকলে এখানে?

– কোয়ারা ভি'কে জিজ্ঞেস কর, কেলভিনের উত্তর।

—কে? কি? মানুষটি তার বই বন্ধ করে দিল।

কেলভিন স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। কিন্তু সব কেমন যেন ফসকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কের পদ্ধতিটি চালু করল। এখন কিছুটা ফলপ্রসূ। সে কেয়ারা ভি'র জগত সম্পর্কে ক্রমশ ওয়াকিবহাল হচ্ছে। ওর পছন্দ ও। পুরনো সবকিছু সে ভুলে যেতে চাইছে।

সে লাল গোঁফওয়ালা মানুষটিকে জানালো, সরল সংশ্লেষ হলেই চলবে।

—তুমি কে শয়তান?

—আমাকে জিম বলে ডেকো, কেলভিন সহজভাবে উত্তর দিল। চুপ কর এবং শোন, সে আবার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো ছোট ছেলের মতো। (ওর সামনে যে মানুষটি বসে আছে সে আমেরিকার একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ)। অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছে প্রোটেন দিয়ে। প্রায় তেত্রিশ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়—

—মোটেও তা নয়।

—হ্যাঁ, তাই। চুপ কর। ঐ অণুগুলো বিভিন্নভাবে সাজানো যেতে পারে। সুতরাং আমরা অসীম সংখ্যার প্রোটেন পেতে পারি। এবং সমস্ত জীবন প্রোটেনরই নামান্তর। সংশ্লেষের সবটুকু অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত এর সঙ্গে প্রোটেনের অণুর তফাত বেশ শক্ত। গণ্ডগোল উপস্থিত হয় এই নিয়ে।

লাল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটি নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করে বলতে শুরু করল, প্রোটেনের অণুগুলোর গঠন নিয়ে। কেলভিন তারপর তার সম্পর্কের পদ্ধতিটা ব্যাপারে জানালো। এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে তার নিজের কথা জানতে ব্যস্ত।

আমি চাই স্বাস্থ্য, সুনাম এবং ভাগ্য। এটা কাজ করবে'ত?

—হ্যাঁ, তবে আমার ভাল মানুষ –

কেলভিনের অনুরোধ এবং আগ্রহ প্রকাশ করায় লাল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটি তার সঙ্গে কাজ করবে এই মর্মে রাজি হ'ল।

—আমার প্রচুর টাকা চাই এবং ভাগ্য।

—তুমি লক্ষ লক্ষ ডলার করতে পারবে। খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো জানালো রাসায়নিক।

—লেখা পড়া, হয়ে যাক এ ব্যাপারে। তুমি একটা কাগজে আমাকে লিখে দাও আমার লক্ষ ডলার সম্পর্কে।

রাসায়নিক তার মাথা দুলিয়ে জানালো, আমি তা পারবো না। আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তবে এ বিষয়ে ভয়ের কিছু নেই। তোমার আবিষ্কারের ফল নিশ্চয়ই অনেক। আর তুমি বিখ্যাত'ও বটেই।

আর স্বাস্থ্য?

কোন রোগ আর হবে না। কিছুক্ষণ পর রাসায়নিক বলল, এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার।

—লিখে দাও। কেলভিন খুশি। না, না পেনসিল দিয়ে লিখলে চলবে না, কালি চাই। রাসায়নিক কালি খোঁজার জন্য ভেতর দিকে চলে গেল। কেলভিনের দৃষ্টি ল্যাবরেটারির চার দেয়ালের দিকে। একটু পরেই দেখে ফুট তিনেক দূরে থার্ন এসে হাজির। তার হাতে একটা সরু লম্বা অস্ত্র। কেলভিন সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের পদ্ধতিটি চালু করলো। এবং থার্ন থেকে সরে এল অনেকটা দূরে। দু সপ্তাহের ক্রমান্বয়ে টানা-টানি করার এই প্রথম ফল।

তার চিন্তাধারা মোটেও ভাল নয়।

নিজে ভীষণ বোকা, এতক্ষণ হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত সে রাসায়নিকের নামটা ও জানেনি।

ঘরের কোণায় কোণায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে স্বাস্থ্য, সম্পত্তি এবং খ্যাতি। কিন্তু কোণা কি? একদিন হয়তো সে খুঁজে পাবে। কিন্তু কবে? তবে এখন থার্নকে দিয়ে কি হবে?

রাসায়নিক এই মুহূর্তে আর কেলভিনকে খুঁজে পাবে না। সে এখন রূপ পেয়েছে কোয়ারা ভি'র। আর আধঘন্টা পর সম্পর্কের পদ্ধতিটি চালু হওয়ার পর সে এ সমস্ত কিছু ভুলে যাবে।

এই সময় বোতামটায় চাপ দিল সে যখন থার্ন অল্প দূরে এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গেই

সব কিছুর পরিবর্তন। স্থান পাল্টে গেছে। কেলভিন যখন মরুভূমির মাঝখানে বসে আছে। ক্যাকটাস আর ঝাউগাছের ছড়াছড়ি। কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে ধূসর পর্বত চূড়া। সুন্দর দৃশ্যাবলী।

যদিও থার্ন নেই, তবু।

কেলভিনের ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে। যদি কোটোটো হঠাৎ করে কাজ করতে যেয়ে থেমে যায়? ওহ! এইভাবে চলতে পারে না। কেন এই ব্যাপার নিয়ে সে প্রথমেই ভাবতে শুরু করেনি?

সমস্যায় সে ক্রমশ চিন্তিত; কি করে আমি থার্নের হাত থেকে মুক্তি পাব? বোতামে চাপ দিল সে……

কিছুক্ষণ পর সে জানতে পারলো উত্তর। এটা খুবই সহজ ব্যাপার হতে পারে। তাড়াতাড়ি চাপ দেওয়ার ব্যাপারটা হঠাৎ করেই গেল থেমে। এই থেকে আবার নতুন চিন্তার স্রোত বইতে থাকলো। সবকিছু এখন সহজ, পরিষ্কার।

সে কিছুক্ষণ থার্নের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

আর কোন রকম সুযোগ না নিয়ে, কেলভিন সমস্যায় পড়েছে এমন ভান করলো, চাপ দিল বোতামে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আবার পুরনো পদ্ধতির জন্য কৃতনিশ্চয় হল। সে শুধু অদ্ভুতভাবে কিছু ভাবনা ভেবেছিল – যে ভাবে কোয়ারা ভি নির্দেশ দিয়েছিলো।

থার্ন যেন কয়েক ফিট পেছিয়ে গেল। গোঁফওয়ালা মুখটা হা দেখে মনে হল কান্নার ভাব।

না, না! কৃত্রিম শরীরটির চিৎকার, আমিও' চেষ্টা করছি—

কেলভিন এখন খুব বেশি ভাবে চিন্তিত। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবনা। কি করে আমি এখন লাল গোঁফওয়ালা মানুষটিকে চিনে বার করবো?

সে বোতামে চাপ দিল।

এই ভাবেই গল্পটি শুরু হয়েছিল।

কোয়ারা ভি বসে আছে সাময়িক ভাবে। সে জানালো সবকিছু আয়ত্তের মধ্যে আছে।

—কি ভাবে আমি তাকাবো! সে বলল।

—তুমি উত্তীর্ণ, থার্ন জানালো, তোমাকে দেখে কেউ সন্দেহ করবে না। বস্তুটি সংশ্লেষ করতে সময়ও লাগবে না বেশি।

খুব লম্বা নয়। আমার মনে হচ্ছে কাপড় – উল কিংবা লিনেনের। হাতঘড়ি, টাকা সবকিছুই ঠিক আছে। তবে হাত ঘড়িটি ছিল অদ্ভুত ধরনের, তাই না? ভেবে দেখ কারো যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হলেই আমাকে জানায়।

—তুমি আবার চশমার কথা ভুলে যেয়ো না, থার্ন জানালো।

কেয়ারা ভি সবকিছু পড়ে নিল। কিন্তু আমার মনে হয়……

—এটাই ভাল হবে। লেন্সের মধ্যে আলোর বিভিন্ন সতর্কতা এবং তোমার পক্ষে এ

হবে এক ধরনের বিশেষ সংরক্ষণ মনের বিকিরণের বিপক্ষে। এই সবকিছুই নিয়ে যেয়ো না অথবা রোবট তার কিছু কৌশলতা দর্শন করাতে পারে।

—তার না করাই উচিত, কোয়ারা বলল, কেউ না কেউ রোবটকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সে কতটুকু পারবে, যাই হোক, আমি বিস্মিত? সে যাই হোক অন্তত সে তার জায়গাটুকু চেনে। আমরা যদি তাকে ধরে বাড়ি না নিয়ে আসি যে কি করবে কিছুই বলা যায় না।

—সে প্রাণিদেহের রসের মধ্যে অবস্থিত, থার্ন জানালো, হঠাৎ করে ওকে তুমি ধরতে পারবে। রোবট সবসময় তার কোন-না-কোন কৌশল দেখাতে চেষ্টা করবে। তুমি সজাগ না থাকলে সে তোমার স্মৃতিপথের ছবি তুলে নিয়ে তার পরিবর্তে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে কৃত্রিম মগজ। ওগুলো রাখা হবে কাচের ওপর। যদি কোন ভুল হয় আমি তোমার ওপর রশ্মি বিকিরণ করব।

কোয়ারা ভি মাথা দোলালো, ভয় পেয়ো না, তোমার জানার আগেই আমি ফিরে আসবো। আমার আজ সন্ধ্যায় সিরিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা আছে, খেলা শেষ করার জন্য।

কিন্তু এই যোগাযোগ সে কোনদিনই করতে পারে নি।

কোয়ারা ভি বাইরে বেরিয়ে এল। যে জামা কাপড় সে পরে আছে ভীষণ আঁট, তাই অস্বস্তি হচ্ছে। ছোট ঘরটি তার সামনে তার ওপর রঙ করা রয়েছে চিহ্ন।

সে ক্যানভাসের পর্দাটা সরিয়ে দিলো। একটা দড়ি কারণবিহীন ঝুলছে—একদম তার মুখের কাছে। তার খোলা চোখে পড়েছে নীলাভ আলো। অনুসন্ধিৎসু মন, সবকিছু হঠাৎ করে এলোমেলো হয়ে গেল, যেন মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তনীয় গতি এসে গেল চলে।

রোবট গম্ভীরভাবে জানালো, তুমি জেমস্ কেলভিন।

ভাষান্তর : শিখা বোস

রোবট যন্ত্রমানব না যন্ত্রদানব

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো রোবটকে যন্ত্রমানব বলে ভাবেন, আবার কেউ কেউ রোবটকে ফ্রানকেনস্টাইনের যন্ত্রদানব হিসেবে কল্পনা করেন। আসলে 'রোবট' শব্দটি কিন্তু এই শতাব্দীর সৃষ্টি। চেকোশ্লোভাকিয়ার নাট্যকার কারেল ক্যাপেক তাঁর 'রুর' (রসুমস ইউনিভারসাল রোবটস: সংক্ষেপে RUR) নাটকে দেখিয়েছেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ কর্মশীল এক নিখুঁত ব্যক্তি বা রোবট কিভাবে মানুষকে তার কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি দিতে গিয়ে শেষে এমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল যে সে আর মানুষের অক্ষমতা বা ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করতে পারল না এবং রসুমসৃষ্ট এই ধৈর্যহীন রোবটগুলি শেষে ভাবল সমস্ত মানবজাতির অস্তিত্ব বিলোপের কথা। নাটকটিতে রসুম-কল্পিত এই রোবট প্রথমে মানবজাতিকে কর্মের যন্ত্রণা বা কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল—যেমন একজন মানুষ তার সহকর্মী আর একজন মানুষকে তার কাজের বোঝা স্বয়ং গ্রহণ করে তাকে কর্মভার থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে। সেখানে আমরা রোবটকে যন্ত্রমানবের ভূমিকা পালন করতে দেখি। নাটকের শেষে যখন আমরা দেখি যে এই ত্রুটিহীন অসহিষ্ণু রোবট মানুষের কাজের দুর্বলতা বা ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করতে পারছে না এবং সবশেষে সমস্ত মানবজাতির অস্তিত্ব বিলোপের কথা ভাবছে, তখন রোবটকে কেউ কেউ যদি যন্ত্রদানব হিসেবে ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁদের কেউ দোষারোপ করতে পারেন না। আসলে রোবটকে আমরা 'মানব' বা 'দানব' হিসেবে যদি চিহ্নিত না করি, তাতেই বা কি আসে যায়! নাট্যকার ক্যাপেক রোবটের সংহার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন বলেই হয়তো আজও আমরা অনেকে রোবট কথাটা শুনলেই একটা সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ করি।

সব লেখকেরাই যে রোবটের সংহার মূর্তির কথা লিখেছেন বা ভেবেছেন তা নয়,

যেমন আইজ্যাক আসিমভ রচিত রোবট মানবজাতির মঙ্গল চিন্তা করে এবং পরোপকারের ইচ্ছা প্রকাশ করে—এককথায় এই রোবট অতি সদাশয় ও পরোপকারেচ্ছু। এখানে আসিমভ্ রোবটের সংহারের চেয়ে সৃজনশীল ভূমিকার কথাই বেশি করে ভেবেছেন। আসিমভ্ রোবটিক্সের তিনটি প্রধান সূত্র বেঁধে দিয়েছেন—যা আজও রোবটকৌশলীদের কাছে সমান আকর্ষণীয়। প্রথম সূত্রটি হল—

'সক্রিয় কোন রোবট অবশ্যই মানুষের কোনরকম ক্ষতি করবে না, এমন কি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও কাউকে কোনরকম ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে অনুমোদন করবে না।'

প্রধানতঃ এই মূল সূত্রটি মনে রেখেই আজও রোবটবিজ্ঞানীরা বা রোবটপ্রকৌশলীরা তাঁদের রোবট-নকসা তৈরি করেন।

অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে যে রোবট কি? রোবট দেখতে কেমন? রোবট কী কাজ করে? রোবটের সঠিক বর্ণনা বা সংজ্ঞা সময় বা কাল তথা প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এমন কি, রোবটের শ্রেণীবিভাজন প্রয়োগবিদ্যার ক্রমবিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পপণ্যোৎপাদী রোবট বলতে আমরা বুঝি সেই সব রোবট যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও যার বাহু স্বচ্ছন্দে ঘোরানো যায়, বাইরে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করা যায়, উঠানো নামানো যায়, এদিক ওদিক ঘোরানো যায় ও বাঁকানো যায়। এক কথায় শিল্পমুখী রোবট সহজবশ্য, বহুমুখী, সর্বার্থসাধক, কর্মশক্তিসম্পন্ন ও উৎপাদনশীল। রোবটের আকৃতি বা গঠন যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে রোবটের যান্ত্রিক হাতটি ঠিক মানুষের বাহু, কনুই ও কব্জির গ্রন্থি বা সংযোগস্থলের মত—যা সহজে ঘোরানো, বাঁকানো বা নানান্ দিকে সঞ্চালিত করা যায়। রোবটের আর এক বিশেষত্ব হল। ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রমগুলি উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনামাফিক অনুসরণ বা অনুবর্তন করা।

একটা রোবটে প্রধানতঃ কী কী অংশ থাকে? রোবটের অন্যতম অংশগুলি হ'ল ঃ

(ক) স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহৃত, চলনসক্ষম যান্ত্রিক কনুইযুক্ত বাহু।

(খ) উপযুক্ত কব্জি।

(গ) সূক্ষ্ম গণনযন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা।

(ঘ) তথ্যাদি যোগানোর প্রান্তিক ব্যবস্থা।

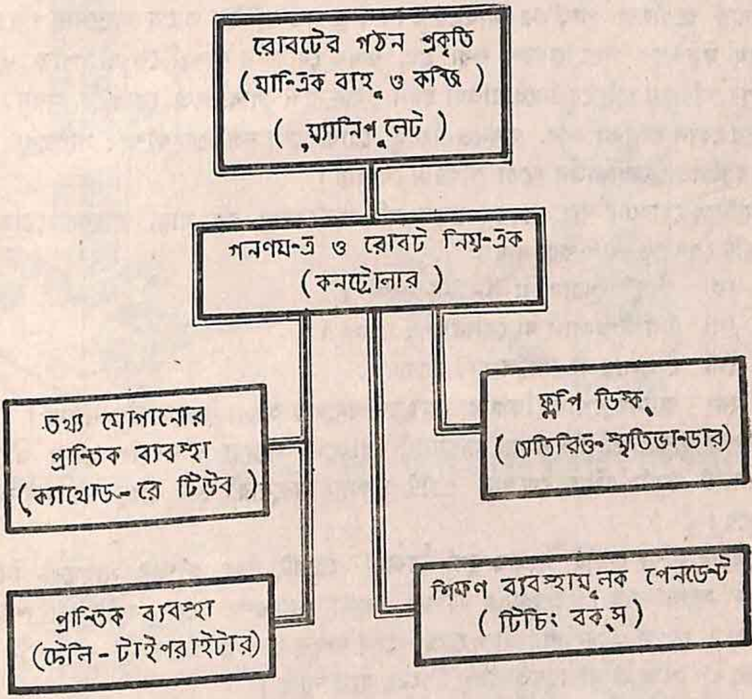
(ঙ) শিক্ষণব্যবস্থামূলক পেন্‌ডেনট্।

(চ) শক্তি-উৎস।

এছাড়া আধুনিকতম রোবটে বোধশক্তিসম্পন্ন অনুভূতি বা সংবেদনশীলতা যোগ করা যেতে পারে যাতে রোবটটি কোন বস্তুর জ্যামিতি, আয়তন, মাপ, মাপের সূক্ষ্মতা, তাপমাত্রা হয় প্রত্যক্ষ স্পর্শ ক'রে অথবা স্পর্শ না করেও অপ্রত্যক্ষভাবে অনুভূতির সাহায্যে বস্তুটি সনাক্ত করতে পারে বা উপস্থিত বুদ্ধি ও দক্ষতা যা তার মগজে

উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, সেই অর্জিত বুদ্ধি বা স্মরণগ্রাহ্য দক্ষতার সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বস্তুটি ইচ্ছেমত ধরতে পারে, ঘোরাতে পারে বা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থাপন করতে পারে।

শ্রেণীবিভাজন প্রসঙ্গে রোবটকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ



১নং ছবি ঃ রোবটের বিশেষ অংশগুলি

(১) রোবটের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় কিভাবে তথ্য যোগান হয় বা রোবটের শিক্ষণব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হয়।

(২) রোবটের আঙ্গিকগঠন কেমন বা রোবটের যান্ত্রিক বাহুর গতি ও সঞ্চালনব্যবস্থা কেমন

রোবটের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অনুযায়ী রোবটটিকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(ক) সারভো-নিয়ন্ত্রিত (সারভোকনট্রোলড্ রোবট্)।

(খ) সারভো-নিয়ন্ত্রিত নয়—এমন রোবট্, যে রোবট্ সারভো-নিয়ন্ত্রিত নয়, সেই রোবট্ যখন তার বাহু সঞ্চালন করে, তখন তা নির্দিষ্ট এক বিন্দু থেকে অন্য এক বিন্দুতে সরলরেখায় বিচ্ছিন্নভাবে যায় এবং এভাবে পরপর বিন্দুগুলি অতিক্রম ক'রে রোবট্‌টি তার গতিপথ নির্ণয় করে।

অন্যদিকে সারভো-নিয়ন্ত্রিত রোবট্ নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে বিচ্ছিন্নভাবেও যেতে পারে অথবা রোবটটি অবিচ্ছিন্নভাবে তার গতিপথ অতিক্রম করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রোবট্ যখন তার বাহু প্রসারিত ক'রে কব্জির সাহায্যে কোন বস্তু স্থানান্তরিত করে, তখন বিচ্ছিন্নভাবে পেঁাছে সে তার পথপরিক্রমা করে। আবার ওয়েল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে যখন ধাতুপাত দুটিকে তাপে গলানোর পর চাপ দিয়ে দৃঢ়ভাবে সংযুক্তিকরণ করা হয়, তখন রোবটের কব্জিটিকে ধাতুপাত দুটির ওপর অবিরাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুরূপ পদ্ধতিতে রোবটটি যখন স্প্রে ক'রে কোন বস্তু রং করে, তখনও কিন্তু রোবট স্প্রে নলটিকে কব্জির সাহায্যে ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজন মতো অবিরাম ঘোরায়।
অন্যদিকে রোবটের বাহুসঞ্চালন ব্যবস্থা যদি পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে রোবটকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

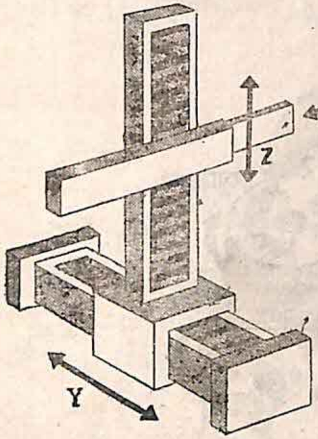
(ক কারটিশিয়ান বা X-Y-Z নকসা।
(খ) সিলিন্ড্রিক্যাল বা বেলনাকার নকসা।
(গ) পোলার বা বর্তুলাকার নকসা।
(ঘ) অ্যানথ্রোপোমরফিক বা নরত্বারোপমূলক অথবা মনুষ্যাকৃতি নকসা।

২ নম্বর ছবিতে প্রতিটি নকসা অনুযায়ী রোবটের সম্ভাব্য গতিগুলি দেখা যাচ্ছে। রোবটটি উপরি-বর্ণিত যেকোন একটি নকসা অনুযায়ী তার বাহু সঞ্চালন করতে পারে।
রোবটের কব্জি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোবট্ তার কব্জির সাহায্যে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে। রোবটের কব্জির নকসা সাধারণত যে বস্তুটি স্থানান্তরিত হচ্ছে বা যে বস্তুটির উপর কাজ হচ্ছে —সেই বস্তুর ধরন ও আয়তনের ওপর নির্ভরশীল। কব্জিটি সাধারণতঃ তিন রকমের হতে পারে।

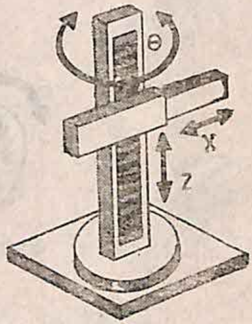
(ক) কব্জিটি পুরোপুরি 'যান্ত্রিক কব্জি হতে পারে। এই কব্জিগুলি চাপ দেবার লিভার ও যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করা হয়।
(খ) কব্জিটি তড়িচ্চুম্বধমী কব্জি হিসেবে কাজ করতে পারে। সাধারণত যে বস্তুকে চুম্বক আকর্ষণ করে, সেই ধরনের বস্তু স্থানান্তরণের প্রয়োজনে তড়িত চুম্বক-শক্তি ব্যবহৃত হয়।
(গ) কব্জিটি সম্পূর্ণ নির্বাত (ভ্যাকুয়াম) হতে পারে। অনেক সময় খুব পাতলা ধাতব বস্তু বা কাগজের মতো পাতলা বস্তুকে স্থানান্তরিত করতে নির্বাত কব্জির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৩নং ছবিতে রোবটের কব্জির একটি নকসা দেখানো হয়েছে। কব্জিটিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘোরানো মোচড়ানো বা বাঁকানো যেতে পারে। মানুষের কব্জির চেয়ে রোবটের কব্জি অনেক দ্রুত ঘোরানো বা বাঁকানো যেতে পারে।
একটি বিশেষ নকসার কব্জি নানান আকৃতির বস্তু ধরতে পারে না। সেজন্য

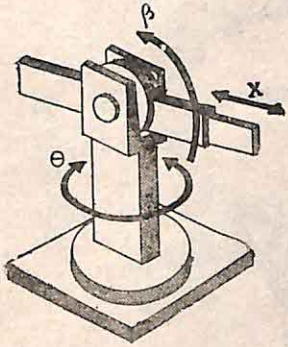
প্রয়োজনমতো কব্জিটির নকসা বস্তুর আকৃতি অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়। অনেক সময় রোবট একই সময়ে নানা আকৃতির বস্তুকে আঁকড়ে ধরার জন্য বহুমুখী



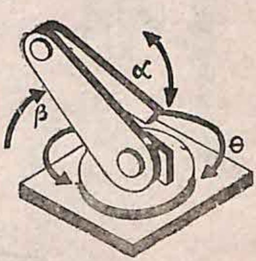
(ক) কারটিশিয়ান বা X-Y-Z নকসা



(খ) সিলিণ্ড্রিক্যাল বা বেলনাকার নকসা



(গ) পোলার বা বর্তুলাকার নকসা



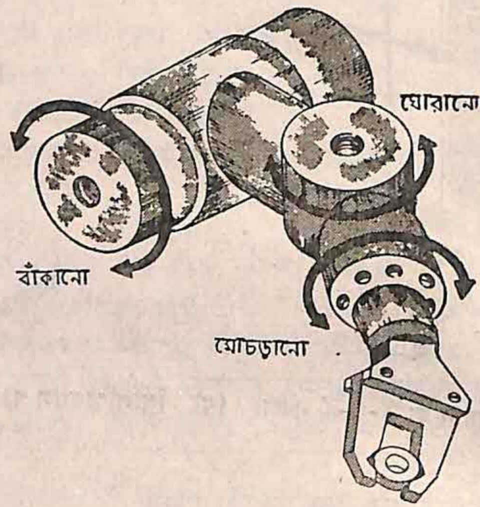
(ঘ) অ্যানথ্রোপমরফিক বা নরত্বারোপমূলক নকসা

২ নং ঃ ছবি রোবটের বাহুর নানান নকসা

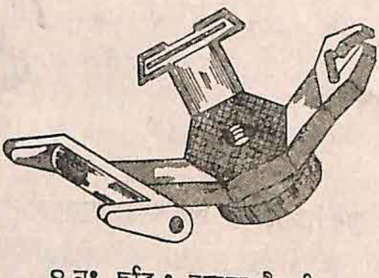
কব্জি ব্যবহার করে। ৪নং ছবিতে ঠিক এরকম একটি নানান কাজের উপযুক্ত বহুমুখী কব্জি দেখানো হয়েছে।

৫নং নম্বর (ক), (খ), (গ), (ঘ) ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে রোবটের প্রসারিত হাতটি

কিভাবে কব্জিটিকে একভাবে রেখে বস্তুটি ধরছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে, হাতটি ঐ অবস্থায় গুটিয়ে নিচ্ছে এবং পরে ৯০° ডিগ্রী ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ৬নম্বর ছবিটির (ক) (খ) ও (গ) অংশে দেখা যাবে কিভাবে রোবট কব্জিটি বাঁকাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে ও ঘোরাচ্ছে।



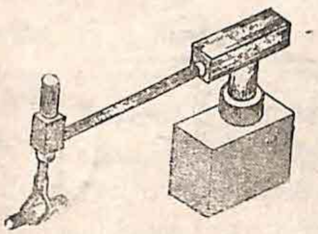
৩ নং ছবি : রোবটের কাজ



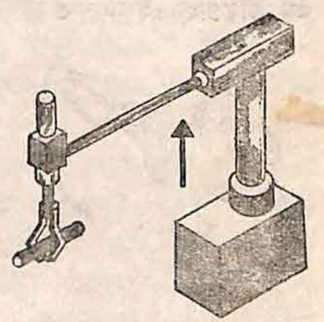
৪ নং ছবি : বহুমুখী কব্জি

৭ নম্বর ছবিতে একটি পূর্ণাঙ্গ রোবট্ দেখা যাচ্ছে। এটি অতি শক্তিশালী উৎপাদনমুখী রোবট। সিনসিনাটি মিলাক্রনটিত রোবট্ নামে এর পরিচিতি। এই রোবট্‌টি গণনযন্ত্র ও উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোবটটির আঙ্গিকগঠন এমন যে এটিকে স্বাধীনভাবে ছটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘোরানো যেতে পারে।

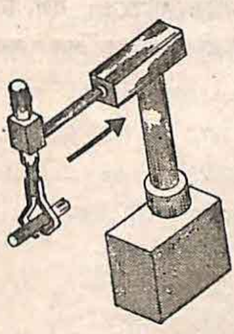
এই রোবট্ প্রায় ১০০ কেজি পর্যন্ত বস্তুর ভার বা বোঝা স্থানান্তকরণ করতে পারে। পূর্ণ ভার নিয়ে এটি সর্বাধিক প্রতি সেকেণ্ডে ৯ মিটার পর্যন্ত গতিবেগে বস্তুটি স্থানান্তকরণ করতে পারে। রোবটটির বাহু উল্লম্বভাবে প্রায় ৩৮০০ মিলিমিটার ও আনুভূমিক প্রায় ২৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারে এবং এক নাগাড়ে প্রায় ২৪০ ডিগ্রী কোণের মধ্যে দ্রুত সামনে ও পেছনে ঘুরতে পারে।



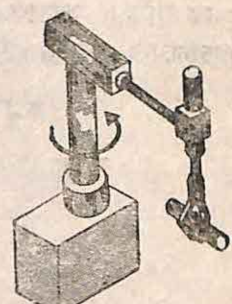
(ক) বস্তুটি ধরা



(খ) উত্তোলন করা



(গ) সঙ্কুচিত করা



(ঘ) ৯০° ডিগ্রী কোণে ঘোরানো

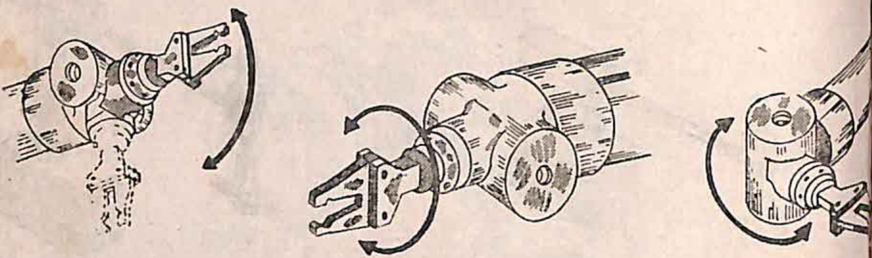
৫ নং ছবি : রোবটের বিভিন্ন ভিন্ন বাহু সঞ্চালন

এছাড়া আছে কৃত্রিম বুদ্ধিযুক্ত রোবট; বুদ্ধিমান রোবট্ বলতে আমরা বুঝি সেই রোবট্ যার অনুভূতি খুব প্রখর, যার বোধশক্তি যাছে এবং যে রোবট তার বোধশক্তি নিয়ে তথ্যাদি বিশ্লেষণ ক'রে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পরে। রোবটে বিশেষ

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নানান্ ধরনের সংকেত গ্রহণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সংকেত গ্রহণ ব্যবস্থাগুলি হল :

(১) স্পর্শজনিত সংকেত
(২) দর্শনলব্ধ সংকেত
(৩) শ্রবণলব্ধ সংকেত

রোবটে স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ অনুভূতি কমবেশি সংযোজন করা হোতে পারে। অনুভূতিগ্রাহ্য এই সংকেত ব্যবস্থগুলি আমরা রোবটের বাহুতে বা কব্জিতে স্থাপন



(ক) কব্জিটি বাঁকানো (ক) কব্জিটি মোচড়ানো (গ) কব্জিটি ঘোরানো

৬ নং ছবি : কব্জির নানান অবস্থান

করতে পারি। আসলে এই সংকেত যন্ত্রগুলির মাধ্যমে সরণ গতিবেগ, বল, চাপ, মোচড়ানোর ক্ষমতা, আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা, বস্তুর সরল অবস্থান, কৌণিক অবস্থান



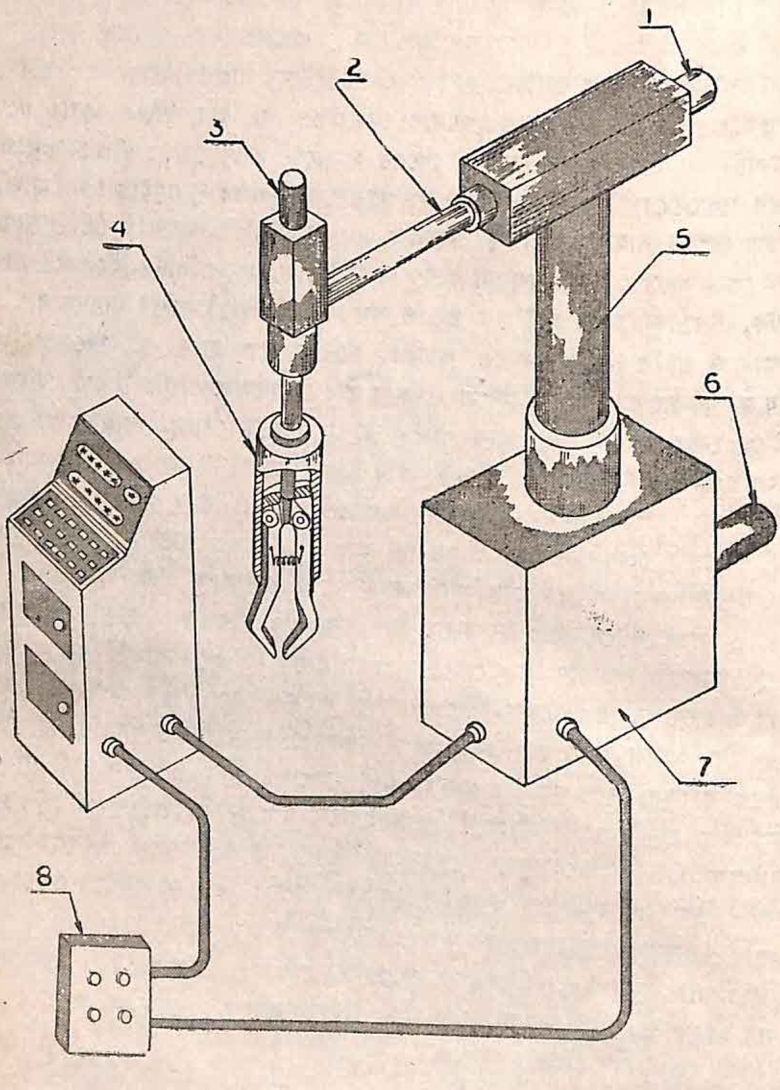
৭ নং ছবি : শিল্পমুখী এক আধুনিক রোবটের নকসা

বা তির্যক অবস্থান, প্যাটার্ন বা নকসা সনাক্তকরণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাজগুলি সম্পন্ন করা যায়। এই সব সংকেতগুলি নানান্ সংকেত মাপার যন্ত্রে ধরা যায়, যেমন দর্শনলব্ধ সংকেত ক্যামেরা বা ভিডিকোণ টিউবের সাহায্যে গ্রহণ করে বস্তুটিকে সনাক্তকরণ করা যেতে পারে। আবার বৈদ্যুতিক বা বায়ুতাড়িত মাপক যন্ত্রে, ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স স্ট্রেইন্ গেজের সাহায্যে, লোড্সেল প্রভৃতি চাপ মাপক যন্ত্রের মাধ্যমে রোবট্ স্পর্শনলব্ধ সংকেত গ্রহণ করতে পারে। মাইক্রোফোন জাতীয় মাপক যন্ত্রের সাহায্যে রোবট্ শ্রবণলব্ধ সংকেত নির্ধারণ করতে পারে। আবার কোন কোন সময়ে রোবট্ স্পর্শ না করেও অপ্টিক্যাল, ক্যাপাসিটিভ, ইলেকট্রোম্যাগ-নেটিক, ইনডাকটিভ বা ফ্লুইডিক প্রভৃতি সংকেত সৃষ্টিকারী যন্ত্রের মাধ্যমে বস্তুটির অবস্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, এই সংকেতগুলি। উপযুক্ত গণনযন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তার ফলাফল রোবটের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পৌঁছে দেয়াও প্রয়োজন। এককথায় কৃত্রিম বুদ্ধিমান রোবটে আমরা মানুষের বোধশক্তিগুলিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি যাতে রোবট্টি সংবেদনশীল মনন ও চিন্তার দ্বারা উৎপাদন সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে। তবে রোবট্ কোনদিনও ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবদান মানুষের সমকক্ষ হবে না, হতেও পারে না। এই কৃত্রিম বোধশক্তি সম্পন্ন রোবট্ মানুষের আজ্ঞাবহ, মানুষের দাস ছাড়া আর কিছু নয়!

৮ ও ৯ নম্বর ছবিগুলিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগে সম্পূর্ণ ভারতীয় যন্ত্রাংশে তৈরি রোবটটি দেখা যাচ্ছে। এই রোবট্টি বায়ুতাড়িত শক্তির সাহায্যে সক্রিয়। রোবটটি বেলনাকার নকসায় তার গতি সঞ্চালন করে। রোবট্টির আসল মগজ হল একটি সূক্ষ্ম গণনযন্ত্র বা মাইক্রোপ্রসেসর যা রোবটের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত মগজে নির্ধারিত ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলি উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থার মাধ্যমে স্মৃতিভাণ্ডারে রাখা হয় যেগুলিকে পরে ঠিক গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজানোর মত পুনরাবৃত্তি করানো হলে রোবটটি ঠিক সেই সেই কার্যক্রমগুলি অনুসরণ করে। এই রোবটটিকে যে কোন গোলাকার বস্তু স্থানান্তরণের কাজে লাগান যেতে পারে।

ইন্জিনিয়ারিং শিল্পে রোবট্কে নানা কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে যে সব উৎপাদনমুখী শিল্পে রোবটের বহুল ব্যবহার সীমাবদ্ধ, সেগুলি হল ঃ

(ক) ডাইকাস্টিং বা ঢালাই কাজে
(খ) ওয়েল্ডিং বা ধাতুসংযুক্তিকরণ কাজে
(গ) ফোরজিং বা কামারশালায়
(ঘ) স্প্রে পেইনটিং বা স্প্রে রঙের কাজে
(ঙ) মেশিনটুলস বা যন্ত্রাংশের স্থানান্তরণ কাজে
(চ) প্লাসটিকের ঢালাই কাজে
(ছ) হিট ট্রিটমেন্টের কাজে



৮ নং ছবি ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত রোবট

(১) X নির্দেশের জন্য বায়ুতাড়িত সিলিণ্ডার (২) বাহু
(৩) কব্জি সক্রিয় রাখার জন্য বায়ুতাড়িত সিলিণ্ডার (৪) কব্জি রোবট নিয়ন্ত্রক
(৫) Z নির্দেশের জন্য বায়ুতাড়িত সিলিণ্ডার (৭) ভিত বা কাঠামো
(৬) Q কোণে নির্দেশের জন্য বায়ুতাড়িত সিলিণ্ডার (৮) শক্তি উৎস

(জ) প্যালেটাইজিং কাজে

(ঝ) ইনস্পেকশন বা পরিদর্শনের কাজে

রোবট্‌কে যেসব শিল্পে সীমিতভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে বা কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে সেগুলি হল :

(ক) শ্রেণীবদ্ধভাবে যন্ত্রাংশের একত্রীকরণ কাজে (অ্যাসেম্বলি)

(খ) প্যাকেজিং বা প্যাকেট করার কাজে

(গ) ফেটলিং বা ঢালাই করা বস্তু পরিষ্কার করার কাজে

(ঘ) টেক্সটাইল প্রসেসিং বা কাপড় তৈরির কাজে

(ঙ) গৃহ নির্মাণ কাজে

(চ) খনি থেকে খনিজ পদার্থ তোলার কাজে

(ছ) মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চায়

আগামীকালে রোবট্‌কে যে সব শিল্পে বা কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে বা চলবে, তা হল :

(ক) শহরের ময়লা পরিষ্কার করার কাজে

(খ) খাদ্যবস্তু তৈরির কাজে

(গ) আণবিক শিল্পে

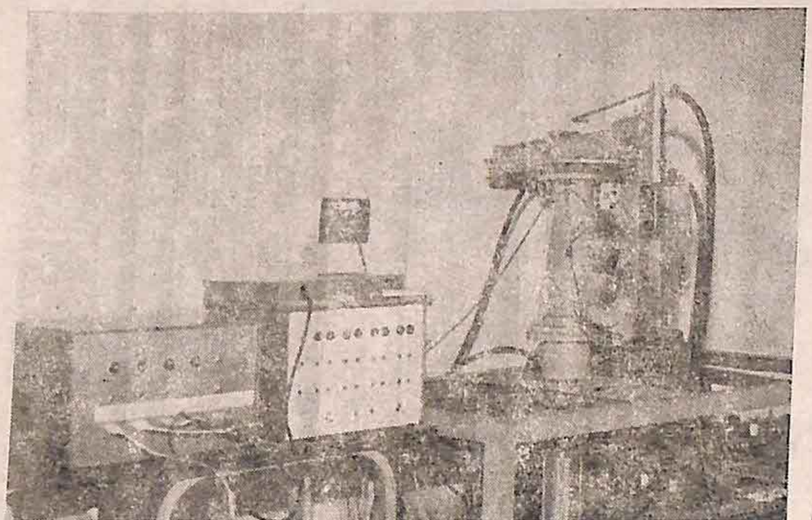
(ঘ) সমুদ্র থেকে খনিজদ্রব্য সন্ধান ও তোলার কাজে

(ঙ) চিকিৎসার নানা কাজে

(চ) সার্জারি বা ডাক্তারি কাটা ছেঁড়ার কাজে

সাধারণতঃ যে আবহাওয়াতে মানুষ কাজ করতে অসমর্থ সেখানে মানুষকে সাহায্যে করার জন্য রোবট্ ব্যবহার করা উচিত। অত্যধিক তাপ, ধুলো, বালি, বা ক্ষতিকর গ্যাস, ধোঁয়া, অত্যধিক শব্দ যা মানুষের ক্ষতি করে, বা যে সব কাজ অত্যন্ত ভারী ও একঘেঁয়ে, সেই সব কাজে রোবটকে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। সহজে মুনাফা লোটার কাজে অনেক সময় আমরা এখনও মানুষকে অমানুষের মতো বা পশুর মতো কাজে লাগাই, সেই সব অমানুষিক বৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য রোবট্‌কে কাজে লাগানো উচিত। তবেই রোবট্ যন্ত্র-দানব আখ্যা না পেয়ে যন্ত্র-মানব রূপে খ্যাতি পারে। আমরা স্বীকার করি বা নাই করি রোবটের যুগ আসছে এবং তা মানুষের কল্যাণের জন্যই। সাহসের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি আমরা এই রোবট্ প্রকৌশল আয়ত্ত করতে পারি, দেশের পক্ষে ও দশের পক্ষে লাভজনক, ও মঙ্গলজনক। প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোবটের আবির্ভাব এক পরম আশীর্বাদ। তাই উৎপাদনমুখী শিল্প রূপায়ণে মানব কল্যাণের জন্য রোবটের উপযুক্ত ব্যবহার সত্যিই প্রয়োজনীয়।

অধ্যাপক : ডঃ সত্যরঞ্জন দেব



রোবটের ফটোগ্রাফ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

লেখক পরিচিতি

আইজাক অ্যাসিমভ

বিশ্বাস শুধুমাত্রই কল্পনা নয় কিংবা অলীক গল্প। যা বাস্তব তাই বিশ্বাস। এবং এর কার্যকারণ ভাল-মন্দ সবকিছু নিয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটাচ্ছি। কোন কিছু বিজ্ঞান ছাড়া নয়।

আইজাক অ্যাসিমভের বাসনা পৃথিবীর সব ধরনের মানুষের মধ্যে এই বিজ্ঞান চেতনা জাগরূক হোক। সব মানুষ যদি ভাবতে শেখেন তবেই তাঁরা হয়ে উঠবেন অনুসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে করে তুলবে সচেতন। তাই অ্যাসিমভের ইচ্ছে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখালেখিকে যত সহজ করে পরিবশন করা যাবে ততই ভাল।

এই বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায়। জন্মস্থানে তিনি বেশিদিন কাটাতে পারেননি। মা বাবার সঙ্গে জন্মগ্রহণের তিন বছর পরেই চলে আসতে হয় আমেরিকায়। শুরু হয় বসবাস, পড়াশোনা। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাসিমভ রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এর পরই ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্মানিত অতিথি হয়েছিলেন বিশ্ববিজ্ঞান কনভেনশনে।

অ্যাসিমভ জীবনে প্রথম পুরস্কার পান ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মারুনেভ অফ ভেস্তা বই-এর জন্য। তিনি জীবনে প্রচুর বই লিখেছেন, এই মুহূর্তে তার সংখ্যা দাঁড়াবে একশোরও বেশি। তিনি রোবটীয় তিন সূত্রের জনক। তাঁর রোবট সম্পর্কীয় গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে যে যে বইয়ে তার নাম ; আই রোবট এবং রেস্ট অফ দি রোবটস্।

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মেশানো অ্যাসিমভের জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় তিনি

নিযুক্ত ছিলেন বৈমানিক সৈন্য গবেষণাকেন্দ্রে। এই কেন্দ্রটি ছিল ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অ্যাসিমভ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর পড়াশোনা থেমে থাকেনি। সমানভাবে করে গেছেন পড়াশোনা।

অ্যাসিমভের জীবনের প্রথম পুরস্কার হুগো পুরস্কার। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পুরস্কার পান তাঁর দি বেষ্ট অল টাইমস্ সিরিজ বইয়ের জন্য। এরপরও দুবার হুগো পুরস্কার পেয়েছেন অ্যাসিমভ। নেবুলা পুরস্কার পান তিনি দি গডস্ দেমসেলভস্ বইয়ের জন্য ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

নাটক এবং ভ্রমণের ওপরেও অবাধ বিচরণ দেখিয়েছেন অ্যাসিমভ। এমন কি অ্যাসিমভের সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। সহজ সাবলীল লেখা। সবার মন কেড়ে নেয়।

রে ব্র্যাডবেরী

ইলিনসিস-এ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাডবেরীর জন্ম হয়। রে ব্র্যাডবেরী নামের সংক্ষিপ্ত-করণ। সম্পূর্ণ নাম রেমন্ড ডগলস ব্র্যাডবরী। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই ব্র্যাডবেরী সময় নষ্ট না করে সদ্ব্যবহার করতেন। সুষ্ঠভাবে বিভিন্ন কাজে নিজেকে যুক্ত করে খুশি হতেন।

কিন্তু সবকাজ করার ফাঁকে ফাঁকে অন্য আর একদিকে তাঁর নজর ছিল দারুণভাবে। সেটা ছিল ব্র্যাডবেরীর লেখার দিক। তিনি নিয়মিত লেখার চর্চা চালিয়ে এসেছেন সমান ভাবে। ছোটবেলা তাঁর কষ্ট করেই কাটে। নাটকের দলে যুক্ত থাকার সময় ভোরে প্রতিদিন নিয়মিত কাগজ ফিরি করতে হোত।

প্রথম জীবনে ব্র্যাডবেরী একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। পত্রিকাটি বেশিদিন চালাতে পারেন নি। ব্র্যাডবোরীর লেখা প্রথম গল্পের নাম পেন্ডুলাম। তিনি এই প্রথম গল্পটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন সাইন্স স্টোরিজ কাগজের কাছে। কল্পনাশ্রয়ী গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে লেখা ব্রাডবেরীর গল্পগুলো ক্রমশ সবার কাছে ভীষণ ভাবে আদৃত হয়। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক লেখায় নিজস্বতা তৈরি করতে পেরেছেন।

এপর্যন্ত ব্র্যাডবেরীর বহু গল্প নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ করে দূরদর্শনের জন্য তাঁর কাহিনী খুবই সমাদৃত।

রবার্ট শিকলে

শিকলে জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে। সৈন্যবাহিনীতে তাঁর প্রথম জীবন কাটে। তিনি ১৯৪৬ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর হয়ে ছিলেন কোরিয়ায়।

শিকলে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে।

শিকলের ছোটগল্প লেখার রীতি একটু অন্য ধরনের। শিকলের প্রধান প্রধান বইগুলো হলো, আনটাচড বাই হিউম্যান হ্যান্ডস্ (১৯৫৪), সিটিজেন ইন স্পেশে (১৯৫৫), পিলি গ্রিমেজ টু আর্থ (১৯৫৮), নেশানস্ আনলিমিটেড (১৯৬০), স্টোর অফ ইনফিনিটি (১৯৬০), দি পিপল ট্র্যাপ (১৯৬৮)।

ফ্রেড স্যাবারজেন

স্যাবারজেন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে। তিনি জীবন শুরু করেন একজন সাধারণ ইলকট্রনিক ট্যাকনিসিয়ান হিসেবে। এবং সেই সময় চারবছর দেশের বৈমানিক সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। স্যাবারজেন তাঁর লেখা-লেখি শুরু করেন এনসাইক্লোপিয়া-ব্রিটেনিকার লেখক হিসেবে।

স্যাবারজেনের প্রথম লেখা বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস ডেথ ফ্রম দি মিড-১৯৬০'জ। অন্যান্য উপনাস ঃ দি গোল্ডেন পিপল (ইউ এস ১৯৬৪), দি ওয়াটর অফ থট (ইউ এস ১৯৬৫), বারসারকার (ইউ এস ১৯৬৭), ব্রাদার বারসারকার (ইউ কে ১৯৬৯), বারসারকারস প্ল্যানেট (ইউ কে ১৯৭৫)।

বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা-লেখির জগতে স্যাবারজেন একটি অবশ্যম্ভাবী নাম। তিনি অসংখ্য ছোটগল্পও লিখেছেন।

আন্তালি দনেপ্রভ

জন্ম ১৯০৩ সালে। ইনস্টিটিউট অফ রেড প্রফেসর থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরে বরিসগলেবসক্ পেডাগোগিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। নানান্ সমস্যামূলক ঘটনাবহুল কাহিনী নিয়েই তাঁর লেখা। তাঁর নভেল, "অ্যাবাউট দি আইডিয়েল ইমেজ ও টিপিক্যাল ইমেজ" এক উল্লেখযোগ্য কাজ।

বিজ্ঞানভিত্তিক কিছু কিছু জটিল লেখাও তাঁর উপন্যাসের ও গল্পের উপাদান হয়ে উঠেছে। "আইভা" এমনি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক রোবটের গল্প।

হেনরী কুটনার

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখকদের মধ্যে এক অন্যতম নাম হেনরী কুটনার। জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে লস এঞ্জেলসে। তিনি প্রথম জীবনে এক সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে থাকাকালীন কুটনারের লেখার দিকে ঝোঁক বাড়ে, এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর একটি দিকে ভীষণ আগ্রহ হয়েছিল তা হচ্ছে—অদ্ভুত

রহস্যময় গল্প পড়া। সেই সমস্ত লেখকদের সঙ্গে তিনি চিঠি দিয়ে যোগাযোগও করতেন। সহযোগিতা চাইতেন লেখার জন্য।
সি সি মুর কুটনারের একজন সহযোগিনী। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের দুজনের প্রয়াসের প্রথম ফসল প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। বইয়ের নাম উইথ কোয়েষ্ট অফ দি স্টার স্টোন। এবং এরপর থেকে নিয়মিত দুজনের সহযোগিতায় প্রকাশনা চলতে থাকে, কুটনারের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কুটনারের মৃত্যু হয়।
শ্রীমতী মুর কুটনারের শুধুমাত্র সহযোগিনীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কুটনারের বিবাহিতা স্ত্রী। দুজনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।
কুটনারের প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই : ফরাসী (ইউ এস ১৯৫০, বইটি লিখেছিলেন লওয়ারেন্স ওডোনিল নামে), ওয়েল অফ দি ওয়াল্ড (ইউ এস ১৯৫২), বিয়ন্ড আর্থশ্ গেটস্ (ইউ এস ১৯৫৪), ভ্যালী অফ দি ফ্লেম (ইউ এস কীথ হেনার্ড নাম), লষ্ট ওয়াল্ড (ইউ এস ১৯৬৪), টাইম অ্যাক্সিস্ (ইউ এস ১৯৬৫), দি ডার্ক ওয়াল্ড (ইউ এস ১৯৬৫)।
গল্পের বই : নম দেয়ার ওয়াজ (ইউ এস ১৯৫০), টুমরো এন্ড টুমরো দি ফেয়ারী চেজম্যান (ইউ এস ১৯৫১), অ্যাহেড অফ টাইম (ইউ এস ১৯৫৩), বেষ্ট অফ কুটনার ১ম (ইড কে ১৯৬৫), বেষ্ট অফ কুটনার, ২য় (ইউ কে ১৯৬৬)।

অধ্যাপক ডঃ সত্যরঞ্জন দেব

মেদিনীপুরের জামালচকে (হলদিয়া) ডঃ দেবের জন্ম হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পাওয়ার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালর থেকে ১৯৬৫ সালে গ্র্যাজুয়েট হন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার ডিগ্রী (উৎপাদন) গ্রহণ করেন ১৯৬৮ সালে। এরপর ডক্টরেট হন (১৯৭২)।
ডঃ দেব পাঁচ বছরের মত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের (সরকারাধীন) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তিনি উৎপাদন প্রযুক্তির অধ্যাপক তবে বিশেষভাবে যুক্ত আছেন অটোমেশন এবং রোবটিক্স নিয়ে যে সমস্ত ছাত্ররা গবেষণা করছে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।